এরই নাম সোনার বাংলা ?

প্রিন্সিপাল ইসহাক আলী

এরই নাম সোনার বাংলা ?

প্রিন্সিপাল ইসহাক আলী

www.pathagar.com

এরই নাম
সোনার বাংলা
?

প্রিন্সিপাল ইসহাক আলী

প্রকাশক
চোকদার মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার (এডভোকেট)
৮১/১, বশীর উদ্দিন রোড,
কলাবাগান, ঢাকা।

(সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রকাশকালঃ
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ অলংকরণ
আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ১৫০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ
বাংলাদেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহ

ERRI NAM SONAR BANGLA ? Written by Principal Ishaque Ali, 435/Kha, Mogbazar, Ramna, Dhaka -1217. & Published by : Chokder Abdus Sattar,81/1, Bushir Uddin Road, Kalabagan, Dhaka, Price : Tk. 150.00; US$ 4.00

www.pathagar.com

লেখকের কিছু কথা

বাংলাদেশ আমার প্রিয় জন্মভূমি। বাংলাদেশ আমার প্রিয় স্বদেশ। বাংলাদেশ আমার প্রিয় আবাসস্থল। আজন্ম আমি এ দেশেই আছি। আমৃত্যু আমি এখানেই থাকতে চাই। আর আমার শেষ নিঃশ্বাসের পরে এ দেশের পূন্য মাটির কোলেই আমার শেষশয্যা রচিত হবে, এটাই আমার আশা। এ দেশের পবিত্র মাটি, আলো-বাতাস, রূপ-রস-গন্ধে ভরা আমার এ দেহ-মন। আমার কাছে বড় পূত-পবিত্র এ সোনার দেশ। এ দেশের প্রতিটি ধুলিকনা আমার প্রানের মতই প্রিয়।

বাংলাদেশের সুখদুঃখ এবং ভালমন্দের সাথেই আমার সুখদুঃখ এবং ভালমন্দ জড়িত। এ দু'য়ের মাঝে কোন তফাৎ নেই। এ দু'য়েকে আলাদা করা যায় না, আলাদা করার কোনই উপায় নেই। তাই এ দেশের ভালমন্দ নিয়ে আমাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হয়। আর তা ছাড়া, এ দেশের একজন চিন্তাশীল নাগরিক হিসাবেও এটা আমার পবিত্র কর্তব্য। কেউ বা কেউ কেউ এ দেশের ভাগ্য বা স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আর আমি চুপচাপ বসে বসে দেখবো, তা তো হয় না। দেশ ও জাতির শত্রু ওই সমস্ত বিভীষনদের আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবো, এটাই তো স্বাভাবিক। আর সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসাবেই আমি কলম ধরেছি; দেশ ও জাতির শত্রুদের মুখ উন্মোচনের জন্যই লিখছি আমার এ বই-"এরই নাম সোনার বাংলা?"

এ দেশে একদল লোক আছে যারা দেশের দুর্দিনে গোটা জাতিকে বিপদের মাঝে ফেলে রেখে ভিনদেশে পাড়ি দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। বিদেশে বিজাতীয় দুশমনদের মাঝে ওদের মামু-খালু আছে। আসলে, ওরা বিজাতীয় চর। এ দেশে বিজাতীয় দুশমনদের যারা চর, তাদের চিহ্নিত করা দরকার। না হলে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বার বারই শুধু বিপন্ন হতে থাকবে। শত বিপদেও, এ দেশকে যারা ভালবাসেন, সেই সমস্ত খাঁটি দেশপ্রেমিকরা তো কোন দিনও এ দেশ ছেড়ে দেশ ও জাতির জঘন্য দুশমনদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেননি। জীবনে আমিও তা কখনও করিনি-করার ইচ্ছে নেই তা কোন দিনও। তাই দেশ, জাতি ও এ দেশের গণমানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য যা আমাদের করনীয়, সে ব্যাপারে দু'একটি কথা বলার চেষ্টা করেছি আমি এ বইতে।

আমি একজন মুসলমান। আমি প্রথমও মুসলমান, শেষও মুসলমান। এ ছাড়া আমি আর অন্য কিছুই নই। একজন মুসলমান হিসাবে আমি কোরআন ও সুন্নাহ্ তথা ইসলামের মৌলনীতিগুলি, যাচাই-বাছাই যা-ই করি কি না করি, অন্ধভাবে বিশ্বাস করি। এ দিক থেকে বিচার করলে, আমি শব্দগতভাবে সত্যিকার অর্থেই, একজন খাঁটি মৌলবাদী। পশ্চিমারা মৌলবাদী বলতে কি বুঝায় আমি জানি না বা বুঝি না। তা আমার বুঝার কোন দরকারও নেই। কারণ, ধর্ম বলতে আজকে ওদের তো কিছু বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।

মরজগতের এ দু'দিনের জীবনের চেয়ে পরকালের অন্তহীন জীবনের দাম আমার কাছে অনেক বেশী। তবে এ ক্ষণিকের জীবনও আমার কাছে মূল্যহীন নয়। ইসলামও কখনই তা বলে না। পরকালের মহাজীবনের মহামুক্তির পাথেয় সংগ্রহ ও উপার্জনের জন্যই আমি এ মরজগতে এসেছি। পরম করুনাময় আল্লাহ্তায়ালা আমাকে বা গোটা মানবজাতিকে এখানে কিছু কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার চাকচিক্য আর ভোগ-বিলাসের মোহে অনেকেই তা ভুলে যায়। কিন্তু ক্ষনিকের তরেও আমি তা ভুলে যাইনি বা ভুলে যেতে চাই না। আমাকে যারা ব্যক্তিগতভাবে চিনেন বা জানেন তারা, আশা করি, আমার এ কথাগুলি অস্বীকার করবেন না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে একজন খাঁটি মুসলমান বা মুমীনের কাজ। আর আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র এবং শুধু একমাত্র পথই হচ্ছে দুনিয়াতে কোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক রাষ্ট্র তথা ইসলামী শাসন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা। অন্যভাবে বলতে গেলে, ইসলামী হুকুমত তথা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা তথা ইসলাম কায়েমের একমাত্র সঠিক পথ ও উপায়। এর আর কোন বিকল্প নেই। ইসলামী হুকুমত কায়েমের পথে সত্যিসত্যিই যাঁরা সংগ্রাম করছেন তাঁরা আমার পরম বন্ধু, সত্যিকার অর্থেই ভাই। আর যারা এর বিরোধিতা করছেন এবং এ পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছেন তারা নিঃসন্দেহে আমার বন্ধু বা ভাই নয়। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী হুকুমত কায়েমের মহান আন্দোলনে কর্মরত অন্যান্য ভাইদের সাথে যে কোন কোরবানী দানে আমি কোন দিনই পিছপা হবো না, যেমনটি হইনি ইতিপূর্বেও।

দুনিয়াতে আজ প্রায় ১৪০ কোটি মুসলমান বাস করে। দুনিয়াতে আজ আছে ৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু, আমার জানামতে, দুনিয়াতে নেই আজ একটিও সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র। যে একটি মাত্র দেশে সত্যিকার ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টা করা হচ্ছিল, সে দেশটিকে পশুশক্তির জোরে ইসলামের দুশমনরা ইতিমধ্যেই অকারনে পদদলিত করে দিয়েছে। দুনিয়ার বহু তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্য থেকে একটিও এগিয়ে আসেনি এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করতে বা তার পক্ষে দু'টি সহানুভূতির কথা বলতে। এটা ঠিক যে, যে ইসলাম-বিরোধী দানবীয়চক্র এ ইসলামী দেশটিকে পদানত করেছে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন মুসলিম দেশের পক্ষে বা সবাই একত্রিত হয়েও প্রতিরোধ গড়া বেশ শক্ত ছিল। কিন্তু তাই বলে ইসলাম তথা মুসলিম উম্মার এ ঘোরতর বিপদে দুনিয়ার তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি চেয়ে চেয়ে শুধু দেখবে আর কোন কিছুই করবে না, তা তো মেনে নেয়া যায় না।

দুনিয়াতে আজ বহু মুসলিম দেশ আছে কিন্তু ইসলামী শাসন নেই কোথাও। এটা কেমন কথা? মুসলমান থাকলে তো ইসলাম থাকতে হবে। আর ইসলাম থাকলে তো ইসলামী সমাজ তথা ইসলামী হুকুমত থাকতে হবে। দুনিয়ার মুসলমানরা আজ ইসলাম থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছে। পবিত্র কোরআনে তো মুসলমানদের জন্য তথা মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য ইসলামী শাসন অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। ইসলামের বিধান অনুসারে দুনিয়ার মুসলমানগন তো একটি মাত্র জাতি। দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষাভাষী যে কোন একজন মুসলমানের বিপদে তো দুনিয়ার বাদবাকী সমস্ত মুসলমানদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে আর মুসলিম জাতিকে নিজেদের ভিতর হানাহানি করতে বারণ করা হয়েছে এবং কোন অবস্থাতেই ইসলামের শত্রুদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়াতে আজ যা দেখছি তা তো সম্পূর্ণ উল্টো। আর এ জন্যই আজ মুসলমানগণ সারা বিশ্বে শুধু মার খাচ্ছে। আজ মুসলমানদের ভিতর সবচেয়ে বেশী দরকার জাতীয় ঐক্য এবং সত্যিকার অর্থেই মুসলমান তথা মুমীন হওয়া। দুনিয়ার মুসলমান একই জাতি এবং দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও দুনিয়ার সুখদুঃখ সবাই মিলেমিশে ভাগাভাগি করে ভোগ করবে, ইসলামের এই মহান শিক্ষায় যে দিন মুসলিম উম্মাহ আবার দীক্ষিত হয়ে নতুনভাবে উজ্জীবিত হতে পারবে সে দিনই শুধু দুনিয়ায় আবার ইসলাম সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে দিন দুনিয়ায় কোন শক্তি নেই যারা মুসলমানদের উপর অন্যায়-অত্যাচার করতে পারবে। বর্তমান বিশ্ব-জটিলতার কারণে বিশ্বে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র থাকলেও গোটা মুসলিম বিশ্বকে অবশ্যই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে একটি মাত্র Single Command বা একক নির্দেশনার পরিচালনায় আসতে হবে। বিভেদ নয়, ঐক্যই হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের মুক্তির একমাত্র পথ। সেই মহাসুদিনের প্রতীক্ষায় পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত কামনা করে আমার আজকের কথা শেষ করছি। আমীন।

www.pathagar.com

প্রকাশকের দু'টি কথা

প্রাচুর্য আর শান্তির আশ্রয়স্থল সোনার পূর্ববাংলা ব্রিটিশ বেনিয়া ও বর্ণহিন্দুদের পৌনে দুইশত বছরের শাসন, শোষণ ও ষড়যন্ত্রের ফলে নিঃস্ব বাংলায় পরিণত হলো। আর সে নিঃস্বতার অভিশাপ বাংলাভাষী মুসলমানদেরকেই বইতে হলো সর্বাধিক। কেবলমাত্র শোষণ ও ষড়যন্ত্রেরই শিকার ছিলাম না আমরা, ছিলাম চরমভাবে নির্যাতিত, অবহেলিত ও পদদলিত এবং এজন্যেই হারিয়ে ফেলেছিলাম আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বকীয় পরিচয়। জঘন্য একটা হীনমন্যতা আমাদের স্কন্ধে সোয়ার হয়ে দারুণভাবে আমাদেরকে অবনমিত করলো। উপমহাদেশের কোন ভূখন্ডের কোন জনগোষ্ঠী এমন অসহায় ও দুর্বলতম স্তরে পৌছেনি। অবাঙালী মুসলমানদের রক্তের বিনিময়ে শুধুমাত্র সমর্থন ও ভোট দিয়ে আমরা পাকিস্তান পেলাম। একটা নিঃস্ব-পদদলিত জাতি রাতারাতি মাত্র চব্বিশ বছরে একটা উন্নয়নশীল জাতিতে পরিণত হলো। পদদলিতদের উত্তর পুরুষরাই প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, প্রশাসক, জজ-ব্যারিস্টার, প্রফেসর ও পুঁজিপতির মর্যাদা পেল। অতএব, সন্দেহাতীতভাবে ন্যায্যতই বলা যায় যে, পাকিস্তান ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

আমাদের মুসলমানত্বের পরিচয় আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার প্রমান। এ স্বতন্ত্র পরিচয়চিহ্ন মুছে গেলে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে একদেহে লীন হওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ থাকবে না। এ সত্যানুভূতি থেকেই লেখনি পরিচালনা করছি এবং মহান দেশপ্রেমিক প্রিন্সিপাল জনাব ইসহাক আলী সাহেবের দেশপ্রেমের সেরা ফসল এ পুস্তকখানি প্রকাশের প্রশ্নে মনস্থির করেছি।

এ পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখকের দেশপ্রেম, উন্নত চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নিদর্শন ফুটে উঠেছে। তিনি ঘটনাবলীর বাস্তব বিশ্লেষণ পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দিক নির্দেশ দানের চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর বিশ্বাসের বিপরীত একটি কথাও লিপিবদ্ধ করেননি। ধর্মনিরপেক্ষ বা সমাজবাদী রাজনৈতিক লেখকদের মত তিনি ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাননি। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনো সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্ব-সচেতনতা ও বিচারবোধের পরিচয় দেননি। তাঁর যদি সামান্যতম সততা, নিষ্ঠা ও বিবেকের দংশন থাকতো তবে তিনি নিজ পুত্রের ডাকাতি ও সুলতানা-দখল, পার্শ্বচর মন্টুর ইঞ্জিনিয়ার তনয়ার সঙ্গে রাক্ষুসী বিবাহ, মেজর ডালিমের পত্নীর বেইজ্জতী, বাংলাদেশী জাতিকে সামরিক হত্যাযজ্ঞের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে পাকিস্তানী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন এবং সারা জীবনের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বা.ক.শা.ল. ব্যবস্থা প্রবর্তন, ইত্যাকার সব ঘটনায় মদদ দিতেন না বা ঘটাতেন না। এত সবের পরেও সততার খাতিরে লেখক এ স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, মুজিব এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এককালের প্রখ্যাত সমাজবাদী লেখক মানবতাবাদী এম.এন. রায় তাঁর Historical Role of Islam পুস্তকে মন্তব্য রাখেনঃ For the orthodox Hindus who constitute the great majority of the Indian population the Musulman, even of noble birth or high education or admirable cultural attainments, is a mlechha-

www.pathagar.com

impure barbarism- who does not deserve a social treatment any better than accorded to the lowest of the Hindus. ---------- No civilized people in the World is so ignorant of Islamic History and contemptaous of the Mohammedan religion as the Hindus. যে জাতি ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ, হীনতা ও কূপমন্ডুকতাকে স্থায়ীভাবে মেনে নিয়েছে তারা সভ্য জাতি এ কথা আমি মেনে নিতে না পারলেও, এ বাস্তব সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হিন্দু সম্প্রদায় দুনিয়ার জঘন্যতম মুসলিম বিদ্বেষী।

আমাদের এককালের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী নেতারা আজও কলিকাতা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ভাগে আনয়ন সম্ভব হয়নি বলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলীকে দায়ী করেন অথচ যে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদ, কলিকাতা পূর্বপাকিস্তানের জন্য ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা, এক ঘন্টার জন্য ব্যবহার করতে দিতেও নারাজ ছিল তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করতে কখনো দেখা যায়নি। ভাষার প্রশ্নেও তারা কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে দোষী করেন। অথচ ভারতে হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরুদ্ধে এদের একটি কথাও লেখতে দেখা যায়নি। এরা অনবহিত নয় যে, কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুভাষী ছিলেন না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও উর্দুভাষা আঞ্চলিক ভাষা ছিল না। হিন্দীর মত উর্দুও ছিল সামরিক বাহিনীর মুসলিম সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত সমাদ্রিত একটি ভাষা। বাংলার আলেম সমাজের শিক্ষার বাহনও ছিল উর্দু। কিন্তু বাংলার বাইরে কেউ বাংলা ব্যবহার করতো না এবং পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে উর্দু কমবেশী প্রচলিত ছিল। এসব কারণে জাতীয় বৃহত্তর ঐক্য সুনিশ্চিত করার জন্য পাকিস্তানের স্রষ্টা রাষ্ট্রভাষা উর্দুর প্রস্তাব করেছিলেন এবং পূর্বপাকিস্তানের সরকারী ভাষার প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন যে, এ অঞ্চলের প্রাদেশিক পরিষদই সেটা নির্ধারণ করবে। অতএব, বাঙ্গালীর মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী, উগ্র- বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীদের এ অভিযোগ ছিল সার্বৈব মিথ্যা।

আসলে ক্ষমতালিপ্সুগোষ্ঠী পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে জনতার সম্মুখে অপাঙক্তেয় বানিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে ক্ষমতাদখলের 'ষ্টেন্স' হিসেবে ভাষা আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিল। ভারত চেয়েছিল বাঙ্গালী জাতীয়তার নামে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করতে। ভারত সফল হয়েছে। বিভক্ত করেছে আমাদেরকে। আমাদের রাজনীতিকদের বর্তমান মন-মানসিকতা পরিবর্তিত না হলে একদিন এ দেশকে গ্রাস করার ক্ষেত্রেও হয়তো ভারত সফল হবে। আজ তা-ই সমগ্র জাতির, বিশেষ করে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে হবে। আর এই পুস্তকখানা সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে বিধায় এটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি। আমি জানি, এ পুস্তকে ভারতের বশংবদদের ক্ষিপ্ত হবার মত অনেক কিছু আছে। কিন্তু এটা তো সত্য যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাদেরকেও তাবেদার ভূমিকা পরিত্যাগ করতে হবে। হীনমন্যতা ত্যাগ করে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ফাঁদ ভেঙ্গে যাতে এ দেশকে সুখী সমৃদ্ধশালী স্বাধীন সার্বভৌম দেশে রূপান্তরিত করতে পারি, সে শক্তিই রাহমানুর রাহীমের কাছে কামনা করছি। ইতিঃ

চোকদার মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার (এডভোকেট)
৮১/১, বশীর উদ্দিন রোড,
কলাবাগান, ঢাকা।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মুসলিম বাংলার যে মহাদূরদর্শী মহাপুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা, আপোষহীন সংগ্রাম ও অতুলনীয় কোরবানীর ফলে সে দিন ১৯০৫ সনে বাংলাকে বিভক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল এবং ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগ' যার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বযুগের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৪৭ সনে উপমহাদেশের মুসলমানগণ ফিরে পেয়েছিলো তাদের হারানো আজাদী এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান যার ঐতিহাসিক ধারাবিবর্তণের ফসল হচ্ছে আজকের এ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ, সেই মহান নেতা নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ এর উদ্দেশ্যে আমি আমার এ পুস্তক "এরই নাম সোনার বাংলা?" উৎসর্গ করলাম। এ উপলক্ষে আমি পরম করুনাময় আল্লাহ্তায়ালার দরবারে মহান নেতার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।-লেখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

ফুলে ফলে ধানে পাটে ভরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা চোখ জুড়ানো মন ভুলানো চিরসবুজের এ দেশ। এ যে আমার প্রিয় জন্মভূমি! এ যে আমার প্রিয় স্বদেশ।

মাঠভরা সোনালী ধান আর পাট এবং নদীভরা রূপালী মাছে সমৃদ্ধ এ দেশ। প্রকৃতি তার দু'হাত উজাড় করে শত নেয়ামতে পূর্ণ করে দিয়েছে এ দেশের প্রতিটি মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, হাওড়-বিল প্রান্তর। অতি উর্বর এ দেশের মাটি। দুনিয়ায় খুব কম দেশই আছে যেখানে বাংলাদেশের মত এত অল্প পরিশ্রমে এত অধিক ফসল উৎপন্ন হয়। তাই স্বভাবতঃই এ দেশের মাটিকে তুলনা করা যায় কাঁচা সোনার সাথে। আর এ জন্যই যুগে যুগে আমাদের কবি-সাহিত্যিকগণ এ দেশকে দুনিয়ার সকল দেশের সেরা দেশ বা সকল দেশের রাণী বলে এর জয়গান গেয়েছেন।

ইতিহাসের শুরু থেকেই এ দেশের মানুষ তাদের উৎপাদিত শস্য ও পন্যসামগ্রী নিয়ে বেশ সুখে-শান্তিতে বসবাস করে এসেছে। মাত্র কিছুদিন আগেও এ দেশের সোনালী ফসল সোনালী পাটের সুনাম ছিল বিশ্বজোড়া। দুনিয়ার কোথাও এমন উৎকৃষ্ট ধরণের পাট উৎপন্ন হতো না। গোটা বিশ্ব তাই চেয়ে থাকতো বাংলাদেশের এই সোনালী আঁশের দিকে। আর এ সোনালী পাটের উপর ভিত্তি করেই একদিন গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্যের ডান্ডি-ম্যানচেষ্টারসহ বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ বহু আধুনিক শহর-বন্দর। পরবর্তীতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে যখন পাকিস্তান কায়েম হল তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হল বহু আধুনিক সুবৃহৎ পাটকল। এর মধ্যে ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জের আদমজীনগরে স্থাপিত আদমজী পাটকলটি ছিল অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ পাটকল। এখানে হাজার হাজার শ্রমিক দিনরাত কাজ করে উৎপাদন করতো লক্ষ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত কাঁচা পাট এবং পাটজাত পণ্য বিক্রি করে অর্জিত হতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা গোটা পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ।

এ ছাড়াও, বাংলাদেশ আদিকাল থেকেই তার উৎপাদিত সূতীবস্ত্র মসলিনের জন্য ছিল বিশেষভাবে খ্যাত। এ দেশের উৎপাদিত মসলিনের তুলনা ছিল না দুনিয়ার কোথাও। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো এ বিশেষখ্যাত পন্য সামগ্রীটি। আর এর বিনিময়ে অর্জিত হতো বহু বৈদেশিক মুদ্রা। মসলিনের ইতিহাস আর খ্যাতি ছিল রূপকথার মতই।

প্রাচীনকাল থেকেই বড় সুখে ছিল এ দেশের মানুষ। অভাব কাকে বলে তা জানতো না তারা। গ্রাম-বাংলায় প্রত্যেকের ঘরেই ছিল গোলাভরা ধান আর পুকুর-ভরা মাছ। হাঁস-মুরগী আর গরুর দুধ ছিল না এমন পরিবার গ্রাম-বাংলায় ছিল না

www.pathagar.com

বল্লেই চলে। জারি সারি পালাগান আর বিভিন্ন খেলাধুলায় মশগুল থাকতো সারা বছর এ দেশের মানুষ। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির দেশ ছিল বাংলাদেশ।

আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নেয়ামতে সমৃদ্ধ মহাসুখের এ দেশটিতে যে কোন অশান্তিই ছিল না তা কিন্তু নয়। আদিকাল থেকে যুগে যুগে বিদেশী লুটেরা জালিমরা হানা দিয়েছে বাংলাদেশের বুকে। হানাদার হায়েনারা বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় নিরিহ মানুষের উপর চালিয়েছে বর্বর ও নিষ্ঠুর অত্যাচার আর নিঃশেষে লুটে নিয়েছে এ দেশের মানুষের সম্পদ। শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা অকারণে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে এ দেশের মানুষের ঘর-বাড়ী এবং সহায়-সম্পদ। কেউ কেউ আবার ধরে নিয়ে গিয়েছে এ দেশের মানুষদের তাদের নিজেদের দেশে এবং সেখানে ব্যবহার করেছে এদের দাসদাসী হিসেবে অথবা বিক্রি করে দিয়েছে বিদেশে কোথাওবা পন্যরূপে। এ সমস্ত লুটেরা দস্যুদের কেউবা এসেছে এখানে সরাসরি হানাদার রূপে আবার কেউবা এসেছে এখানে বিদেশী বেনিয়া বেশে। তবে সবচেয়ে জঘন্য ও নিষ্ঠুর লুটেরার দল এসেছে এ দেশের মানুষের ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে তাদের ত্রাণকর্তা সেজে মিত্রবাহিনীর ছদ্মাবরণে। আল্লাহ্‌র দেয়া অশেষ নেয়ামত এ দেশের মানুষ কোন দিনই নির্ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে পারেনি। তাই সুখের পাশাপাশি এখানে দুঃখের অবস্থান ছিল প্রায় সর্বদাই।

তবে বাংলাদেশের মানুষের এ দুর্দিনের অনেকটাই লাঘব হয় এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের সত্যিকার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিরই গোড়াপত্তন হয় এতদঞ্চলে মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার সাথে সাথে। উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে যদিও মুসলিম শাসনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন শুরু হয় সুলতান মাহ্‌মুদের সতের বার ভারত আক্রমন ও বিজয়েরও অনেক পরে তুর্কী বাদশাহ্ মোহাম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন শুরু হবার পর থেকে। আর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন আরম্ভ হয় এরও পরে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে দুঃসাহসী মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে মাত্র সতের জন জানবাজ মুসলিম মুজাহিদের দ্বারা বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মন সেনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করার মাধ্যমে। রাজা লক্ষ্মন সেন মাত্র সতের জন মুসলিম সৈন্যের ভয়ে প্রাণ নিয়ে দলবলসহ রাজপ্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এ ভাবেই সে দিন বাংলার বুকে স্থাপিত হয়েছিল ইসলামের বিজয় নিশান।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এখানকার হিন্দু রাজা ও সামন্তগণ যে মাঝে-মধ্যে আবার ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেননি তা কিন্তু নয়। তবে যত-বারই তারা সে চেষ্টা করেছেন প্রায় ততবারই তারা মুসলিম শক্তির কাছে মাথা নত করে হার মানতে বাধ্য হয়েছেন। গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন তাদের

www.pathagar.com

কোনদিনই সফল হয়নি।

দুনিয়ার অন্যান্য সকল দেশের মত বাংলাদেশেও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে স্থানীয় জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের উপর কোন রকম জোরজবরদস্তি বা হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ইসলামের শাশ্বত উদারতার কারণেই এখানকার মুসলিম শাসকগণ স্থানীয় অমুসলিম জনসাধারণের উপর শাসকশ্রেণীর ধর্ম ইসলামকে চাপিয়ে দেয়ার ন্যূনতম চেষ্টা বা আগ্রহও প্রকাশ করেননি বরং জনসাধারণকে দিয়েছেন তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালন করার অবাধ সুযোগ ও স্বাধীনতা। বহু মুসলিম শাসকই স্থানীয় জনসাধারণ তথা হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকদের বহু উপাসনালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুনঃনির্মান ও সংস্কার কাজে উদার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে ধর্মীয় সহনশীলতার এক আদর্শ নজির স্থাপন করেছিলেন। যারাই এখানে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে তারা সবাই ইসলামের মহান আদর্শ এবং সার্বজনীন উদারতা ও মহানুভবতায় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়েই স্বেচ্ছায় ইসলামকে তাদের মুক্তির পথ ও অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছে।

কিন্তু তা হলে কি হবে! এখানকার এক শ্রেণীর ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়া হিন্দু ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম শাসনকে কোনদিনই সুনজরে দেখেনি বা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এদের অনেকেই অবশ্যি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের রাজদরবারে বিভিন্ন উচ্চপদ ও সুযোগ-সুবিধাদি লাভ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাজবংশীয় শাসনামলে তাদের নিজেদের বোন বা মেয়েদের মুসলিম শাসক ও বাদশাহ্‌দের কাছে সানন্দে বিয়ে দিতেও কোন রকম দ্বিধা করেনি বা তাদের ধর্ম-জাত-কুল নষ্ট হবার মত কোন রকম অসুবিধা মনে করেনি। এ ভাবেই মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহসহ বহু হিন্দু রাজা বা সামন্ত দিল্লী ও বাংলার শাহী বা রাজদরবারে তাদের জন্য বহু উচ্চপদ লাভ করে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছেন এবং রাজদরবারে উচ্চপদ লাভে সমর্থ হয়ে রাজকর্ম পরিচালনায় মুসলিম রাজা বা বাদশাহ্‌দের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এমনি করেই এরা দিল্লীর মুঘল বাদশাহ্‌দের ভিতর সবচেয়ে কমশিক্ষিত বাদশাহ্ আকবরের কাছে একাধিক হিন্দু রমনী বিয়ে দিয়ে তাঁকে ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম তাহ্‌জীব ও তমদ্দুন থেকে প্রায় পুরোপুরিই পথভ্রষ্ট করে তাঁর দ্বারা দীন-ই-ইলাহী নামে একটি তথাকথিত ধর্ম প্রবর্তন করাতে সক্ষম হয়েছিল। আসলে, এই দীন-ই-ইলাহী কোন ধর্মই ছিল না। এটা ছিল কতিপয় হিন্দু চক্রান্তকারী কর্তৃক অশিক্ষিত ও অজ্ঞ বাদশাহ্ আকবরকে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতবর্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলিম শাসনকে চিরতরে নির্বাসিত করার এক সুচতুর কূটকৌশল মাত্র। তাই দেখা যায় যে, যে সমস্ত হিন্দু মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ বাদশাহ্ আকবরকে এই তথাকথিত নতুন ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিল তারা নিজেরাও শেষ পর্যন্ত এই ধর্ম গ্রহণ করেনি বা এর বিস্তারে সত্যিকার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এর পিছনে হিন্দু চক্রান্তকারীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, বাদশাহ্ আকবর এবং সাধারণ

www.pathagar.com

মুসলিম সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝি ও বিভেদ সৃষ্টি করে উপমহাদেশ থেকে মুসলিম শাসন চিরতরে উৎখাত করা।

আর এ কারণেই তারা মুঘল সম্রাটকুলমনি সাচ্চা প্রজাহিতৈষী চরম উদার পরম পরধর্মসহিষ্ণু দরবেশরূপী খাঁটি মুসলমান বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনি। কারণ তাঁর একমাত্র 'দোষ' ছিল, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ও সাচ্চা মুসলমান বাদশাহ্। তাই এ দেশের এক শ্রেণীর মুসলিম-বিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু বুদ্ধিজীবী তাঁর বিরুদ্ধে নানান কুৎসা ও অপবাদ রচনা করতে এতটুকুও দ্বিধা করেনি। অথচ ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নির্মম সত্যি কথাটি হচ্ছে যে, উপমহাদেশের গোটা মুসলিম শাসনামলের ভিতর বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবই ছিলেন সেই মহান ও উদার সম্রাট যাঁর শাসনামলে ভারতবর্ষের হিন্দুদের বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মন্দির নির্মান ও সংস্কারের জন্য রাজকোষ থেকে উদার ও মুক্তহস্তে সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও এ দেশের এক শ্রেণীর মুসলিম-বিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দুদের কাছে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন অতিশয় খারাপ লোক এবং জ্ঞানহীন অজ্ঞ বাদশাহ্ আকবর ছিলেন একজন মহান সম্রাট। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব পরধর্ম এবং বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রতি পরম উদার ও সহনশীল থাকলে কি হবে, তিনি তো কোন হিন্দু রমনী গ্রহন করার বিনিময়ে উপঢৌকন হিসাবে কোন হিন্দু সামন্তকে রাজ দরবারে বিশেষ কোন মুসলিম-বিরোধী ষড়যন্ত্রের সুযোগ করে দেননি। অথচ বাদশাহ্ আকবর একাধিক হিন্দু পত্নী গ্রহণ করে বহু হিন্দুকে রাজদরবারে উচ্চপদে স্থান করে দিয়েছিলেন। আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, সম্রাট আওরঙ্গজেব ভুলেও কোনদিন ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম স্বার্থের সাথে বেঈমানী করে হিন্দু বা অন্য কোন ধর্মের প্রতি কোন স্বার্থের মোহেই কোন রকম অস্বাভাবিক প্রীতি বা দুর্বলতা প্রকাশ করেননি কারণ তিনি ছিলেন ইসলাম সম্পর্কে অতি জ্ঞানী ও সচেতন একজন আদর্শ মুসলমান বাদশাহ্। অন্যদিকে, বাদশাহ্ আকবর ছিলেন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ এবং দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত পথভ্রষ্ট ও নামেমাত্র মুসলমান একজন বাদশাহ। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয় সুখ তথা তাঁর জৈবিক কামনা-বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য হিন্দুধর্মব্যবস্থার সাথে আপোষ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ, সাধারণভাবে তিনি ছিলেন একজন অশিক্ষিত লোক এবং বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল নিতান্তই সীমিত। আর এ কারণেই এ দেশের মুসলিম-বিদ্বেষী এক শ্রেণীর হিন্দু ঐতিহাসিকদের কাছে বাদশাহ্ আলমগীর ছিলেন চরম নিন্দনীয় আর বাদশাহ্ আকবর ছিলেন পরম পূজনীয়।

এ উপমহাদেশে মুসলিম আগমণের শুরু থেকে অদ্যাবধি মুসলিম বাদশাহ্ ও শাসকদের প্রতি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়া হিন্দুদের এ অযৌক্তিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান আছে। মুসলিম শাসকদের ভিতর যাঁরাই মুসলমান হিসাবে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান তাঁরাই এদের কাছে অস্পৃশ্য, অসহ্য ও খারাপ, তা তাঁরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু

www.pathagar.com

জাতির প্রতি যত কল্যানকর ও ভাল কাজই করুন না কেন। অন্যদিকে, মুসলিম শাসকদের ভিতর যারা ইসলাম ধর্মবিমুখ এবং স্বীয় ধর্ম ও জাতির স্বার্থের বিনিময়ে হিন্দুধর্ম ও জাতির প্রতি আপোষকামী ও দুর্বল তারাই পরম পূজনীয় ও মহান, তা শাসক বা মানুষ হিসাবে হোক না তারা যতই খারাপ বা নিন্দনীয়।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসন তথা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি এ দেশের এক শ্রেণীর হিন্দুদের এ মনোভাবের মূলে রয়েছে সেই বিশেষ সত্যটি যে, এ উপমহাদেশে মুসলিম আগমন ও শাসনের শত শত বছর পরেও এখানকার একশ্রেণীর হিন্দু এখানে মুসলিম আগমন, শাসন ও উপস্থিতিকে আজও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা আজও এখানে মুসলমানদের উড়ে এসে জুড়ে বসা অবৈধ জবরদখলকারী বাসিন্দা হিসাবেই গন্য করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই এখান থেকে মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য প্রহর গুনছে। আর এ কাজটি করার জন্য সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে, যেমন করেই হোক মুসলমানদের ভিতর একটি শ্রেণীকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে অন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আত্মকলহ সৃষ্টি করে ইউরোপের স্পেন দেশের মতই ভারতবর্ষ থেকেও মুসলমানদের চিরতরে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ব্যবস্থা করা। কারণ, তারা ভাল করেই জানে যে, গায়ের জোরে সোজা পথে মুসলমানদের এখান থেকে উৎখাত করা অতীতেও সম্ভব হয়নি আর ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

দুই

ক্ষমতার লড়াই আর উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বিবর্তনের ইতিহাসের এক পর্যায়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি হিসাবে আবির্ভূত হন নবাব আলীবর্দী খাঁ। এ সময় বাংলাদেশের জনসাধারণ মারাঠা দস্যুদের অবাধ লুণ্ঠন ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে ছিল জর্জরিত। ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা দস্যুরা বার বার এ দেশ আক্রমন করে মানুষের ধনসম্পদ ও সহায়সর্বস্ব লুটে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল। গ্রাম-বাংলায় মানুষ বর্গীর হামলার ভয়ে সদাসর্বদা ভীত-স্বন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। মারাঠা দস্যুরা বাংলার মানুষের উপর "চৌথ" আদায়ের নামে যে কি বর্বর অত্যাচার করতো তার নমুনাস্বরূপ আজও এ দেশে প্রচলিত আছে সেই ছড়াটি- "ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে; বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?"

এ ছাড়াও, বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনের বিরুদ্ধে নানা বিদ্রোহ তাঁকে বেশ ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। রাজ্যে শাসন ক্ষমতা সুসংহত করার পূর্বেই নবাব আলীবর্দী খাঁ ইহলোক ত্যাগ করেন।

নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী তাঁরই অন্যতম দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে আরোহন করেন। তখন নবাব সিরাজদ্দৌলার বয়স ছিল নিতান্তই কম-মাত্র ২৩ বছর। সিংহাসনে আরোহন করার পরে মসনদের উত্তারাধিকার নিয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলার খালা ঘসেটি বেগম এবং খালাতো ভাই শওকত জং এর সাথে ব্যাপক বিরোধ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া, দেশে তখনও বর্গী হামলার ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা তো ছিলই। এর উপর আরেকটি বিরাট সমস্যা নতুন নবাবকে বিশেষভাবে বেকায়দায় ফেলে। যদিও নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলেও বাংলাদেশে বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী মোঘল বাদশাহ্ ও নবাবের ফরমান নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পরে তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনে বসার সাথে সাথে তারা বেশ বেপরোয়া হয়ে উঠে। ইংরেজ বণিকরা তাদের ব্যবসার ব্যাপারে নবাবের অনুমতি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি আর তেমন গুরুত্ব দিতে চাচ্ছিল না। তারা এ দেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক যেখানে খুশি সেখানে নিত্য নতুন কুঠি ও আস্তানা গাঢ়তে শুরু করে। এমন কি, তারা নতুন নবাবের বিরুদ্ধে তাঁর পারিষদ ও আমলাদের ভিতর নানারকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। এ কথা নবাবের কানে এলে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের উপর বেশ চটে যান এবং দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাশে যখন দুর্যোগের এমন ঘনঘটা তখন উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের যারা চিরশত্রু সেই মুসলিম-বিদ্বেষী হীন ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এবার বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠে। তারা গোপনে বিদেশী বেনিয়া গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নবাব সিরাজদ্দৌলারই রাজদরবারে বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিশ্বাসঘাতক ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জঘন্য শত্রু জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, নন্দকুমার প্রমুখ হিন্দু ব্যক্তিবর্গ তাদের এ হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার জন্য বলির পাঠা হিসাবে বেছে নেয় নবাব সিরাজদ্দৌলারই আত্মীয় স্বাধীন বাংলার সিপাহ্শালার মীর জাফর আলী খাঁকে। এ সমস্ত বেঈমানরা একদিকে ইংরেজদের নবাবের বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্তভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে, অন্যদিকে তারা ইংরেজদের পক্ষে গোপন আঁতাত করে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে এই বলে বিভ্রান্ত করতে থাকে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা শাসক হিসাবে নিতান্তই অপরিপক্ক ও অযোগ্য; তাই তারা নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বাংলার মসনদ থেকে সরিয়ে দিয়ে সিপাহ্শালার মীর জাফর আলী খাঁকে একজন সুযোগ্য নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করতে চায়। এ সব বেঈমানরা নির্বোধ ও আহাম্মক মীর জাফরকে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, তারা সবাই মনেপ্রাণেই বাংলার মঙ্গল চায় কিন্তু এ কাজটি নবাব সিরাজদ্দৌলা দ্বারা সম্ভব নয়; বাংলার সুযোগ্য নেতৃত্বের একমাত্র ক্ষমতা ও যোগ্যতা শুধুমাত্র সিপাহ্শালার মীর জাফর আলী খাঁরই আছে এবং এ কাজে তারা তাঁকে নিঃস্বার্থভাবেই সাহায্য করতে চায়। তারা আহাম্মক মীর জাফরকে এও বুঝাতে সক্ষম হয় যে, নবাবকে সরাতে হলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবকে যুদ্ধে নামিয়ে রণক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকলেই যথেষ্ঠ হবে-এ জন্যে কোন গোলা-বারুদ বা লোকক্ষয়ের দরকার হবে না। আর এ জঘন্য ষড়যন্ত্র ও হীন কূটকৌশলের ফলেই সে দিন ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে এক নীলনকশা আর পাতানো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের অস্তগমন শুরু হয় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের এক দুঃখজনক পরাজয়ের মাধ্যমে।

নির্বোধ মীর জাফর সে দিন একটুও বুঝতে পারেনি, আসলে জগৎ শেঠ-উমিচাঁদরা কি চাচ্ছিল, কি ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। মীর জাফর ভাবতেও পারেনি যে, এ সমস্ত হিন্দু সামন্তবর্গ আসলে নবাব সিরাজদ্দৌলার অপসারণ চায়নি, সত্যিকারভাবে তারা এ দেশ থেকে মুসলিম শাসন তথা মুসলিম শক্তির উৎখাত চেয়েছিল এবং নির্বোধ সিপাহ্শালার মীর জাফর আলী খাঁকে তারা বেছে নিয়েছিল শুধুমাত্র কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্য। এ সমস্ত মুসলিম-বিদ্বেষীরা ভাল করেই জানতো যে, সরাসরি যুদ্ধ করে ইংরেজদের সাথে নিয়েও তারা মুসলিম শক্তিকে পরাজিত ও উৎখাত করতে পারবে না। তাই চানক্য কূটনীতির অনুসারীরা সে দিন এক শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য অন্য শত্রুকেই বেছে নিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, নবাব সিরাজদ্দৌলার মত দেশপ্রেমিক শক্তিধর নবাবকে সরাতে পারলে নির্বোধ ও অযোগ্য

www.pathagar.com

মীর জাফরকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে তাদের কোন বেগই পেতে হবে না। তা ছাড়া, তারা এও বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলিম শক্তিকে একবার পরাভূত করতে পারলে বিদেশী বেনিয়া ইংরেজ শাসকদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতে অতটা কষ্ট হবে না। কারণ, মুসলমানগণ ভারতবর্ষে শুধু শাসন করতেই আসেনি, তারা এখানে এসেছে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেও। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আসা ইংরেজরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেনি, তারা এসেছে মূখ্যতঃ বাণিজ্য করতে তথা এ দেশ থেকে কিছু ধনসম্পদ তাদের নিজেদের দেশে পাচার করতে। তাই স্থায়ী বড় শত্রু মুসলিম শাসকদের উৎখাত করতে হলে এ সমস্ত মুসলিম-বিদ্বেষীদের বৃটিশ বেনিয়াদের পক্ষ নেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। আর এ কাজটি হাসিল করার জন্য যদি ছলচাতুরীরও আশ্রয় নিতে হয় তাতে দোষের কোন কিছু তো তাদের শাস্ত্রে নেই।

কিন্তু আহাম্মক মীর জাফর তো এর কিছুই বুঝতে পারেনি। তাই লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যুই হল তার শেষ পরিণতি। আর বুদ্ধিদোষে সে উপমহাদেশের ইতিহাসে বেঈমান ও স্বাধীনতার শত্রু বিশ্বাসঘাতক হিসাবেই চিরপরিচিত হয়ে রইল। মীর জাফরের বোকামীর জন্য আজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ বুঝতে বা জানতে পারলো না যে, কেন ও কি অবস্থায় সে দিন বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল এবং বাংলার স্বাধীনতার আসল শত্রু ও সত্যিকার বিশ্বাসঘাতক কারা। কথায় আছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ কথার যথার্থতা আমরা পলাশীর পরবর্তী অদ্যাবধি এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। যারা সত্যিকারভাবে দেশকে ভালবাসেন তাদের অবশ্যিই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক নির্দেশনার এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যথার্থ দৃষ্টি ও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। নতুবা এ দেশে যুগে যুগে নতুন নতুন সিরাজদ্দৌলার জান কোরবাণী দিতে হবে ও নিত্য নতুন মীর জাফর সৃষ্টি হবে এবং আসল স্বাধীনতার শত্রু জাতীয় বেঈমান, ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের চেনা যাবে না।

তবে কথায় বলে, "আল্লাহ্‌র মার দুনিয়ার বা'র" বা "পাপ বাপকেও ছাড়ে না।" বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বেলায়ও হয়েছিল তাই-ই। জগৎ শেঠ-উমিচাঁদসহ প্রধান তেরজন বিশ্বাসঘাতকের প্রত্যেকেরই হয়েছিল অপমৃত্যু, কেউই তাদের পাপের শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি। পাপী পরকালে তো শাস্তি পাবেই। তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই সে তার কৃতপাপের কিছু শাস্তি অবশ্যিই ভোগ করে যায়। এটা যুগে যুগে দেশে দেশে এবং বিশেষ করে ইদানীংকালের আমাদের দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর দিকে তাকালেই আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারি। ন্যূনতম সাধারণ বুদ্ধি থাকলেই এটা বুঝা যায়, অন্য কারুরই বলে দিতে হয় না।

www.pathagar.com

তিন

শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পরে স্বভাবতঃই মুসলমানগণ ইংরেজদের বিরোধিতা করতে থাকে এবং ইংরেজরাও মুসলমানদের শত্রু হিসাবেই গন্য করতে থাকে। এটাই ছিল স্বাভাবিক। একদিকে, ইংরেজরা মুসলিম জাতিকে বিশ্বাস করতে পারছিল না আর অন্যদিকে, মুসলমানগনও ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করার কোন কারনও খুঁজে পাচ্ছিল না। ইংরেজ ও মুসলিম শক্তির ভিতর অবিশ্বাস ও দূরত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছিল। আর এ অবস্থাটা সোনায় সোহাগা হিসাবে বিবেচিত হল এ দেশীয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদীদের কাছে। উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এতদিন হিন্দু জনগোষ্ঠী মুসলমান বাদশাহ্ ও নবাবদের রাজদরবারে শুধু রাজকর্মচারী ও গোমস্তা হিসাবে তাদের খেদমত ও তাবেদারী করে আসছিল। কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করার পরে এবার হিন্দুরা ইংরেজ রাজদরবারে সমস্ত উচ্চপদ ও দেশের ভূসম্পদ দখল করার কাজে উঠে পড়ে লেগে যায়। নব্য শাসক ইংরেজরাও হিন্দু জনগোষ্ঠীর এ কাজে বেশ সাহায্য-সহযোগিতা ও মদদ প্রদান করতে থাকে। কারণ, ইংরেজরা বেশ ভাল করেই জানতো যে, অদূর ভবিষ্যতে তাদের শাসন ক্ষমতার আসল হুমকি হচ্ছে এখানকার মুসলিম শক্তি, হিন্দু জনগোষ্ঠী নয়। এ ছাড়া, তারা এও ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজরা দেশ শাসন করার পরে উচ্ছিষ্ট হিসাবে হিন্দুদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলেই তারা খুশিতে গদগদ করতে থাকবে কিন্তু মুসলমানগন অন্য কিছু নয়, সুযোগ পেলেই রাজসিংহাসন কেড়ে নিবে। তাই ভারতবর্ষে তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরেজরা ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও 'অধীনতামূলক মিত্রতা' সমেত এমন সব ব্যবস্থা গ্রহন করতে থাকে যার ফলে অচিরেই বাদশাহ্‌র জাতি মুসলমানগণ ভারতবর্ষে ফকিরের জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর অন্যদিকে, মুসলমানদের পরিত্যক্ত সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য হিন্দুরা তলে তলে ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া জমিদারী, ব্যবসাবাণিজ্য এবং রাজদরবারে ও শাসনকার্যে বিভিন্ন উচ্চপদগুলি দখল করে নেয়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঘৃনা ও বিদ্বেষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এ চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ একদিন এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিরোধিতা সর্বাত্মক বিপ্লব তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ নেয়। ১৮৫৭ সনের এ স্বাধীনতা যুদ্ধ বা 'সিপাহী বিপ্লব' ছিল মূলতঃ ভারতবর্ষে ইংরেজদের কাছ থেকে মুসলমানদের হারানো শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারেরই এক ব্যাপক প্রয়াস ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কিন্তু যেহেতু

www.pathagar.com

এ বিপ্লব ভারতবর্ষের গোটা মুসলিম জনগনের কাছে সমানভাবে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি ও বিপুল অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি এবং সাধারণভাবে এ দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী এ আন্দোলনে আন্তরিকভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেনি তাই ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শক্তিকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম এ মহান আন্দোলন করুন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ভারতবর্ষ থেকে মুসলিম শাসনের শেষ চিহ্ন দিল্লীর মুঘল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্কে বার্মায় নির্বাসন দেয়া হয় এবং তাঁর ছেলেদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ ভাবেই ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের যবনিকা টেনে একচ্ছত্র বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিপ্লব শেষ হয়ে যাবার পরে ইংরেজরা মুসলিম শক্তির প্রতি স্বভাবতঃই আরও বেশী বৈরী ও কঠোর মনোভাব গ্রহন করে এবং অন্য দিকে, মুসলমানগনও ইংরেজদের থেকে নিজেদের আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে চরম অসহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে, মুসলমানদের সার্বিক বৈষয়িক অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হতে শোচনীয়তর হতে থাকে। আর এ অবস্থার সুযোগে হিন্দুরা প্রায় সমস্ত চাকরী-বাকরী এবং ব্যবসাবাণিজ্য দখল করে নেয়।

এমতাবস্থায়, উপমহাদেশের কতিপয় দূরদর্শী মুসলিম মনীষী ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতি এ দেশীয় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ভুলবুঝাবুঝি ও ব্যাপক বৈরী মনোভাব দূর করার মহান ব্রত ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ মুসলিম মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দ একদিকে যেমন ইংরেজদের মন থেকে মুসলমানদের প্রতি ব্যাপক ভুলবুঝাবুঝি ও শত্রুতা দূর করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন অন্যদিকে তেমনি তারা মুসলমানদের প্রতিও অবস্থা ও প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজদের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান। এ আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান কাজ হিসাবে তাঁরা মুসলমানদিগকে ইংরেজী ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল-কলেজ গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। এর মধ্যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক আলীগড়ে প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এ্যাংলো অরিয়েন্টাল কলেজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যার সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই পরবর্তীকালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে অদ্যাবধি উপমহাদেশের মুসলিম শিক্ষা আন্দোলনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

যা হোক, এ সমস্ত দূরদর্শী মুসলিম মনীষীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও তদবিরের ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে ইংরেজদের প্রতি অকারণ বৈরী মনোভাব কাটিয়ে উঠে কিছু কিছু চাকরী-বাকরী ও সুযোগ-সুবিধা লাভে সমর্থ হতে

www.pathagar.com

শুরু করে। কিন্তু এ অবস্থাটাকে এ দেশীয় হিন্দু ব্রাহ্মন্যবাদী জনগোষ্ঠী ঠিক স্বাভাবিকভাবে গ্রহন করতে রাজী ছিল না। তারা এতদিনে দখলকরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধায় নব্য শিক্ষিত মুসলমানদের ন্যুনতম ভাগ এবং নামেমাত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনও একেবারেই সহ্য করতে পারলো না। তারা মুসলিম জনসাধারনের এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রধান অন্তরায় হিসাবে ধরে নিয়ে অকারনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজ-মানসে মুসলিম-বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানা ফন্দিফিকির আঁটতে থাকে এবং ইংরেজ-তোষণের মাত্রা দিন দিন আরও বাড়িয়ে দিতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে তারা ১৮৮৫ সালে লর্ড এ.ও. হিউম নামে এক ইংরেজ সাহেবের নেতৃত্বে তাদের তথাকথিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল, 'অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস' গড়ে তোলে। এ দলটির হিন্দু সংগঠকগণ এই বলে ইংরেজদের বুঝাতে থাকে যে, এ দেশের হিন্দুরা ভারতবর্ষ শাসনের রাজদন্ড চায় না, তারা চায় ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি তাদের স্বতঃস্ফুর্ত ও অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করতে এবং এর বিনিময়ে সরকারী চাকরী-বাকরী, ব্যবসাবাণিজ্য ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে। এভাবে হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাদের আসল মতলব গোপন রেখে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এ দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও নেতৃত্ব থেকে সুকৌশলে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মত দূরদর্শী মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠনের পিছনে এ দেশীয় মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দু নেতাদের আসল উদ্দেশ্য গোড়াতেই ঠিক ধরে ফেলেছিলেন। তাই তারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের এ হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠনটির সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে নিজেরা আলাদাভাবেই নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা আদায়ের পরামর্শ দেন। এর পরেও, কতিপয় মুসলিম নেতা 'অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র, সদস্যপদ গ্রহন করে এ দেশে হিন্দু-মুসলিম মিলন ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এক যুক্ত ও সর্বভারতীয় রাজনীতি প্রচলনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সে মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে ও তাদের মোহ ভঙ্গ হতে খুব বেশী সময় লাগেনি।

উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের স্বার্থ আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দূরদর্শী এই মহান নেতা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দু কর্তৃত্বাধীন কলিকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলাকে আলাদা করতে না পারলে পূর্ব বাংলা ও আসামের তুলনামূলকভাবে কমশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন কোন দিনও সম্ভব হবে না। তাই তিনি এ উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ইংরেজ রাজশক্তিকেও এ ব্যাপারে সম্যক বুঝাতে সক্ষম হন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমান জনসাধারণ এবং ইংরেজদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলা এবং

www.pathagar.com

আসামকে পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা উচিত আর এ নতুন প্রদেশটির রাজধানী হওয়া উচিত ঢাকা। নওয়াবের এ কথায় ইংরেজগনও যুক্তি খুঁজে পান এবং অচিরেই ভারতবর্ষের তদানিন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সনের ২০শে জুলাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৬ই অক্টোবর এক রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা করে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন যার রাজধানী হয় ঢাকা।

ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুন প্রদেশ গঠনের আন্দোলন ও তার প্রতি জোরালো মুসলিম সমর্থনের প্রধান কারণ ও উদ্দেশ্য ছিল পশ্চাদপদ পূর্ব বঙ্গীয় মুসলমানদের উন্নতি সাধন। কেননা, শাসন ক্ষমতা হারাবার পরে এতদিনে বাংলাদেশের এবং বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমানগন শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য এবং চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে অনেক বেশী অগ্রসরমান হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় অনেক বেশী পিছনে পড়ে গিয়েছিল। ফলে, এতদঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল বেশ করুন। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুরা এ পরিবর্তন তথা বঙ্গভঙ্গকে একেবারেই সহ্য করতে পারলো না। তাদের ভয় হল, পশ্চিম বাংলার এতদিনকার পশ্চাদভূমি পূর্ব বাংলা আলাদা হয়ে গেলে কলিকাতা-কেন্দ্রিক হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন পাটকলসহ অন্যান্য শিল্পকারখানাগুলো অচিরেই কাঁচামাল অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া, এতদিন পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদের কর্তৃক উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত বালাম চাল এবং সেখানকার নদীর রূপালী ইলিশ মাছের চালান বন্ধ হয়ে গেলে পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলিকাতা শহরে বসবাসকারী হিন্দু বাবুদের সমস্ত আরাম-আয়েশ সহসাই হারাম হয়ে যাবে। তাই হিন্দুরা মনের আসল কথা গোপন রেখে তাদের বঙ্গমাতাকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে, এই ধুয়া তুলে গোটা ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের সর্বত্র এক সহিংস বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন গড়ে তুলে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নিদর্শনস্বরূপ বাংলার হিন্দুরা উঠতি বয়সের হিন্দু মেয়েদের তথাকথিত "রাখিবন্ধন" আন্দোলনের নামে রাস্তায় ছেড়ে দেয় এবং এর দ্বারা মুসলিম যুবকদের তাদের দলে টেনে নেয়ার নোংরা ও হীন প্রচেষ্টা চালায়। এ ছাড়া, হিন্দুরা সারা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী বার বার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বঙ্গভঙ্গ একটি স্থিরকৃত ও চূড়ান্ত ব্যাপার বলে আশ্বাস দেবার পরেও হিন্দু সন্ত্রাসী ও আন্দোলনকারীদের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের খুশী করার জন্য ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবার হলে এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ ঘোষণা করেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও সার্বিক কল্যাণের বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাসী হিন্দুদের তথাকথিত 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনে অনুপ্রেরনা ও উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সময় যে কবিতাটি রচনা করেন, ঘটনার বিবর্তনে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাই আজ শতকরা ৯০ জন মুসলমান অধ্যুষিত স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

www.pathagar.com

এ ভাবেই সে দিন এ দেশের হিন্দুরা ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির ভবিষ্যৎ স্বপ্নের মত একটি স্বাভাবিক শুভ ও মহৎ পদক্ষেপকে অকারণ শত্রুতার হীন চক্রান্তের মাধ্যমে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে প্রয়াস পায়। তবে হিন্দু জনগোষ্ঠী তাৎক্ষনিকভাবে বিজয় লাভ করলেও এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ও ফলাফল রোধে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীকালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা এবং আসামের কিয়দংশ নিয়ে যে পূর্ব পাকিস্তান এবং আরও পরে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয় তা আর কিছুই নয়, এই বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থারই সরাসরি ও প্রত্যক্ষ ফলাফল।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নে ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে এবং তাঁর বেগমের প্রায় সব স্বর্নালঙ্কার বন্ধক রেখে বাংলার মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজকল্যানমূলক ব্যবস্থা ও কার্যক্রম গ্রহন করেন। তিনি গোটা ভারতবর্ষের মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সার্বিক উন্নতির জন্য ১৯০৬ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় এক সর্বভারতীয় "মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন" আহবান করেন। ঢাকার এই সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছাড়া তৎকালীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলিম নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখ অনুষ্ঠিত অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের মুসলমানদের আজাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক নিজস্ব রাজনৈতিক দল "অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ" গঠিত হয়।

www.pathagar.com

চার

১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সনের বঙ্গভঙ্গ রদ এর মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের এ শিক্ষা ও উপলব্ধি হয় যে, এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয় এবং এতদঞ্চলের হিন্দুরা মুসলমানদের কোন ন্যায্য দাবি-দাওয়াও সহানুভূতির চোখে দেখতে রাজী নয়। বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন থেকে মুসলমানগণ তথাকথিত জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস' সম্পর্কেও এ কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এ দলটির হিন্দু নেতারা মুখে যাই বলুক না কেন, আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করা, অন্য কোন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা নয়। তাই বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পরেই এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সহিংস ও সন্ত্রাসী আন্দোলন গড়ে তোলা হয় তা প্রতিহত করে উপমহাদেশে মুসলিম স্বার্থরক্ষা ও অধিকার আদায়ের দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প নিয়ে ১৯০৬ সনের ৩০শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' ধীরে ধীরে মুসলমানদের জাতীয় সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এর পরেও, উপমহাদেশের বহু স্বনামধন্য মুসলিম নেতা হিন্দু-মুসলিম মিলন ও ঐক্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যিনি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তারপরে মুসলিম লীগে যোগদান করার পরেও কায়েদ-ই-আযম অনেক দিন একই সাথে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় দলেরই নেতা হিসাবে সক্রিয় থাকেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কায়েদ-ই-আযমসহ এ সমস্ত নেতারা বেশ বুঝতে পারলেন যে, কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতের মুসলমান জনসাধারণের মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। তাই তাঁরা একে একে প্রায় সবাই কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগের পতাকাতলে জমায়েত হন। অবশ্যি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মত মুসলিমনামধারী হিন্দু জাতীয়তাবাদের তল্পিবাহক কেউ কেউ যে শেষ পর্যন্তও কংগ্রেসে থেকে যাননি বা সেখানে থেকে মুসলিম জাতির স্বার্থ ও আশাআকাঙ্খার সাথে বেঈমানী করেননি, তা নয়। তবে এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ শেষ পর্যন্ত মুসলিম জাতিসত্তার সাথে তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেন এবং হিন্দু জাতি ও স্বার্থের দালাল বলেই বিবেচিত হতে থাকেন।

দীর্ঘদিন কংগ্রেসে থেকে যখন কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ দেখতে পেলেন যে, কংগ্রেস নেতারা মুসলমান জাতির কোন স্বার্থ ও অধিকারের ব্যাপারেই আন্তরিকভাবে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল নয় তখন তিনি কংগ্রেসের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরোপুরিই মুসলিম লীগে সামিল হয়ে যান এবং যথাসময়ে এ দলের নেতৃত্ব গ্রহন করেন।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এ দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং এখানকার জনগণের জোর দাবি ও চাপের ফলে ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সনের দু'দু'টি শাসনতান্ত্রিক আইন (এ্যাক্ট) এর মাধ্যমে এখানকার বৃটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষ শাসনের ব্যাপারে এ দেশীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহনের দাবি কিছুটা হলেও মেনে নেন এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যৎসামান্য স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ রাজশক্তিকে পুরোপুরি বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনও জোরদার হতে থাকে। এমতাবস্থায়, ১৯৩৯ সনে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন অবস্থার চাপে বৃটিশ সরকার এ অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয় যে, এ দেশের জনগণ যদি সাময়িকভাবে যুদ্ধে বৃটিশ রাজশক্তিকে সাহায্য করে তা হলে তারা যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপারে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে।

অন্যদিকে, তীক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুযোগ্য নেতা কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের কর্নধার নির্বাচিত হয়েই এক পর্যায়ে তাঁর বিখ্যাত দ্বিজাতিতত্ত্ব মতবাদ প্রকাশ করে এ দেশের হিন্দুজাতি ও বৃটিশ রাজশক্তিকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, ভারতবর্ষ শুধু একটি জাতির আবাস নয়, এখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি জাতি বসবাস করে। ধর্ম, কৃষ্টি, আচার, অনুষ্ঠান, সভ্যতা ও সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে ভারতবর্ষে মুসলিম জনসাধারণ হিন্দুজাতি থেকে স্বতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। তাই স্বাধীনতা দিতে হলে বৃটিশ সরকারকে অবশ্যই ভারতবর্ষ ভাগ করে দু'টি আলাদা জাতির জন্য দু'টি আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টি করে দিতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সনে তৎকালীন ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি ও দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। চৌধুরী রহমত আলী এ নতুন মুসলিম রাষ্ট্রটির নাম পাকিস্তান বলে প্রস্তাব করেন। ইতিহাসের এ স্বাভাবিক বিবর্তনের এক পর্যায়ে ১৯৪০ সনে পাঞ্জাবের নগরী লাহোরে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধান উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল সমন্বয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহন করা হয়। ইতিহাসে এই প্রস্তাবকেই লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ ঐতিহাসিক প্রস্তাবের প্রস্তাবক ছিলেন বাংলারই স্বনামধন্য জনবরেন্য নেতা মরহুম শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে অতি দ্রুত ইহা মুসলমানদের জাতীয় দাবি রূপে সমাদৃত হয় এবং মুসলিম লীগই ভারতবর্ষের মুসলিম জনসাধারনের একমাত্র মুখপাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে। সর্বভারতীয় জাতীয় দল হিসাবে কংগ্রেসের দাবি এরপর আর কারও কাছে গ্রহনযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বৃটিশ সরকার উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা বুঝে নেয়ার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে

www.pathagar.com

যৌথ উদ্যোগ গ্রহনের আহবান জানান এবং ইতিমধ্যে 'ক্রিপ্‌স মিশন' ও 'কেবিনেট মিশন প্লাণ' নামে দু'টি প্রস্তাবনা পেশ করেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, কংগ্রেসের অনমনীয় ও অযৌক্তিক মনোভাবের ফলে একটি সর্বভারতীয় কাঠামোর অধীনে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুসলিম লীগের সমস্ত চিন্তা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপে তাদের স্ববিরোধী মনোভাব ও চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল বার বার। এ উপমহাদেশকে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের শেষ ও চূড়ান্ত চেষ্টা ও পদক্ষেপ হিসাবে যখন বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে 'কেবিনেট মিশন প্লান' ঘোষনা করেন তখন কংগ্রেস প্রস্তাবটি প্রথমে গ্রহন করলেও পরে যখন মুসলিম লীগও দলীয়ভাবে একে গ্রহন ও অনুমোদন করে তখন হঠাৎ করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্ববিরোধী ও প্রত্যাখ্যানমূলক মনগড়া কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এ প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে তিনটি "জোন" বা ভাগে বিভক্ত করে একটি সর্বভারতীয় ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রস্তাবিত তিনটি গ্রুপের ভিতর সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি এবং বাংলা ও আসাম নিয়ে আরেকটি মোট দু'টি অঞ্চলই ছিল মুসলিমপ্রধান। কেবিনেট মিশন প্লানের প্রস্তাব অনুসারে তিনটি গ্রুপের প্রত্যেকটিই শাসনকার্যে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং এর যে কোন অঞ্চল ইচ্ছে করলে ফেডারেল সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার মত যথেষ্ঠ শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। মুসলিম লীগ প্রস্তাবটির এ আকর্ষনীয় দিকগুলো দেখতে পেয়ে যখন তা গ্রহন করলো তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এর অন্তর্নিহিত আসল তাৎপর্য ও বিপদ বুঝতে পারলো। তাই তারা এবার এর বিরুদ্ধে স্ববিরোধী ও আক্রমনাত্মক বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে শুরু করে। এমনি এক অবস্থায় যখন কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ক্ষমতায় গেলে কংগ্রেসের শাসনে ফেডারেল সরকারের স্বরূপ কি হবে বা কংগ্রেস কি ভাবে দেশ শাসন করবে, তখন উত্তরে পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ধরন হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন এবং প্রয়োজনবোধে ফেডারেল সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাবিত কেবিনেট মিশন প্লানের যে কোন ধারা বা অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে যথাযথ সংশোধন করে নেবে। নেহেরুর এ হঠকারী, আপত্তিকর, দুরভিসন্ধিমূলক, বিভ্রান্তিকর ও মনগড়া শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদানের সাথে সাথে ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

এ অবস্থায় মুসলিম লীগ এক জরুরী বৈঠকের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং কংগ্রেসের এ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুসলিম জাতিসত্তাকে রক্ষা করার জন্য ১৯৪৬ সনের ১৬ই আগষ্ট 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' দিবস ঘোষণা করে কংগ্রেস নেতার এ মনগড়া ও উস্কানিমূলক বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশে ব্যাপক গণজমায়েতের আয়োজন করে।

উপমহাদেশের মুসলিম জনতার এ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অকারণে এবং বিনা উস্কানিতে ব্যাপক সহিংস ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাহাঙ্গামার

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে এবং তারা এ দেশ থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সমূলে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যাপক গণহত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। অগণিত মুসলিম মা-বোনের উপর হিন্দু ও শিখ গুণ্ডারা পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং কোটি কোটি টাকার মুসলিম ধনসম্পদ লুট ও ভস্মীভূত হয়। সে দিন যদি বাংলার মুসলমানদের অকৃত্রিম বন্ধু অসীম সাহসী সিংহপুরুষ তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী না থাকতেন তা হলে পশ্চিম বাংলা এবং বিশেষ করে কলিকাতা নগরীতে যে একজন মুসলমানও জানে বেঁচে থাকতো তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যা হোক, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চাপিয়ে দেয়া এ পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের প্রথম দিকে একতরফা মার খেলেও শেষ পর্যন্ত যখন মুসলমানগণও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে এ পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ থেমে যায়। কিন্তু এর মধ্যেই জানমাল ও মানসম্ভ্রমের অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। এ দাঙ্গার ফলে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয় তা হলো এই, এরপরে উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আর কোন সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চিন্তা একেবারেই অবাস্তব ও অকল্পনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে, হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও অবিশ্বাস একেবারেই অলঙ্ঘনীয় হয়ে পড়ে।

এমনি এক অবস্থায়ই ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান বা ভারতীয় ডোমিনিয়ন নামে দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম নেতাদের সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামকে বিভক্ত করে এ সমস্ত প্রদেশের একটি বিরাট অংশ হিন্দুস্থানকে দিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র দু'টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়-পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমাঞ্চল তথা পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম বাংলাকে বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলা এবং আসামের কিয়দংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং খণ্ডিত পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হয়। জম্মু, কাশ্মীর ও হায়দারাবাদসহ কতিপয় স্বাধীন ও দেশীয় রাজ্য ছাড়া বাদবাকী অঞ্চল নিয়ে হিন্দুস্থান বা ভারতীয় ফেডারেশন গঠিত হয়।

www.pathagar.com

পাঁচ

বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের সাফল্যে উদ্দীপ্ত অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এ দেশের মুসলিম-বিরোধী হিন্দুশ্রেণী ভাবতেই পারেনি যে, তাদের তীব্র বিরোধিতা এবং সহিংস আন্দোলনের পরেও ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে মাত্র ৭ বছরের মধ্যে এ উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমে এখানে আবার নতুন করে মুসলিম শাসনের ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৭৫৭ সনের পলাশী রণাঙ্গনে ইংরেজদের সাথে যে সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল এবং অদ্যাবধি সযত্নে ও নিষ্ঠার সাথে লালিত নিবিড় মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার পরেও বৃটিশ সরকার যে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক রকম বেঈমানী করেই উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক মুখপাত্র মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহন করবে তা কংগ্রেস বা হিন্দু নেতাদের ধারনার বাইরে ছিল। তা না হলে ক্রিপ্স মিশন প্লান এবং বিশেষভাবে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহন করার মাধ্যমে তারা একটি সর্বভারতীয় ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার নামে এ দেশে মুসলমানদের উপর অতি সহজেই একটি কেন্দ্রীয় হিন্দুশাসন চাপিয়ে দিতে পারতো। তাই যখন সত্যি সত্যিই পাকিস্তান নামে একটি নব্য মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি হল ভারতবর্ষে তখন কংগ্রেস নেতারা একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র পাকাতে আরম্ভ করে। প্রথমেই, হিন্দুস্থানী নেতারা স্বাধীনতা-ঘোষণার শর্তানুসারে বৃটিশ সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে জমাকৃত টাকা থেকে প্রাপ্য নায্য অংশ পাকিস্তানকে দিতে অস্বীকার করে। এ ছাড়াও, সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন ধরনের সহায়-সম্পদের মধ্যে পাকিস্তানের ভাগে প্রাপ্য অংশ থেকে এক কানাকড়িও কংগ্রেস নেতারা পাকিস্তানকে দেয়নি। এ অবস্থায় ভারতীয় হিন্দু সমাজের আপামর জনগণের পূজনীয় নেতা ভারতীয় কংগ্রেসের দার্শনিক আদর্শপুরুষ মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধী পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য অনশন শুরু করলে শাসক কংগ্রেস নেতারা ভাগে প্রাপ্য টাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পাকিস্তানকে দিয়ে দেয়। তবে এর পরে আর কোন টাকা বা সম্পদ তারা আর পাকিস্তানকে আজ পর্যন্তও দেয়নি। কিন্তু পাকিস্তানের এ ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে দিতে বলার জন্য চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্র হিন্দু জনগোষ্ঠীরই মূর্তপ্রতীক হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘের সক্রিয় সদস্য নাথুরামের হাতে গুলিতে প্রাণ দিতে হলো গান্ধীজীকে।

টাকাপয়সা এবং সহায়সম্পত্তির ভাগ থেকে পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে হিন্দুস্থানের কংগ্রেস নেতারা চেয়েছিল গোড়াতেই পাকিস্তানকে অচল করে দিতে। কিন্তু তখনকার দিনে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক পাকিস্তান আন্দোলনের প্রাণপুরুষ এবং পাকিস্তানের

www.pathagar.com

প্রথম গভর্ণর জেনারেল মহান নেতা কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং পাকিস্তানের আপামর মুসলিম জনসাধারণের অকৃত্রিম দেশপ্রেম, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের জন্যে আর সর্বোপরি পরম করুনাময় আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম রহ্‌মতের ফলে কংগ্রেস নেতাদের সৃষ্ট সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা ও বিরূপ স্রোত কাটিয়ে উঠে পাকিস্তানের তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার বেশ দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে দিন দিন দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

স্বাধীনতা লাভের পরে হিন্দুস্থানের হিন্দু কংগ্রেস নেতারা তাদের চিরাচরিত সুবিধাবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশেষ বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকেই তাদের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে গ্রহন করেন। এর পিছনে তাদের দুরভিসন্ধি ছিল, গোড়া থেকেই পাকিস্তানকে নানাভাবে হয়রানি করার কাজে হিন্দুদের সাথে সাথে বৃটিশ জাতিরও অনুকম্পা ও সহযোগিতা লাভ করার অপপ্রয়াস। এ ছাড়া, তারা গোলামীর এ শেষ চিহ্নটুকু ধারন করে দেশ শাসনের ব্যাপারে আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে কোন ছেদ বা শূন্যতার সৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ারও কৌশল গ্রহন করে এর মাধ্যমে। অন্যদিকে, পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পরে একদিনের জন্যও আর কোন ঔপনিবেশিক শাসনের চিহ্ন বজায় রাখতে রাজী হয়নি এবং মুসলিম লীগের সুযোগ্য নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের সফল প্রাণপুরুষ কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে দেশের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে মনোনীত করে। এ দু'টি ঘটনার মধ্যেই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম মানস ও চরিত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দুরা করতে পারে না এমন কিছুই নেই কিন্তু কোন কারনেই ইসলাম-বিরোধী বা নীতিবিবর্জিত কোন কিছু করা কোন সত্যিকার মুসলমানের পক্ষে আদৌও সম্ভব নয়। উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম রাজনীতির সার্বিক ধারার আলোকে বিচার করে এ কথার যথার্থতা প্রমান করা মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে নতুন রাষ্ট্রটির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে কিছু কিছু সমস্যা ও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা হলো, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ প্রশ্নটি। পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের একক কোন সাধারণ ভাষা ছিল না যাকে রাষ্ট্রভাষা বলা যায় বা করা যায়। পূর্ব পাকিস্তানসহ পাঁচটি প্রদেশের জনগণের মাতৃভাষা ছিল পাঁচটি আলাদা আঞ্চলিক ভাষা। তবে পূর্ব পাকিস্তানসহ শাসকদল মুসলিম লীগের অনেক নেতারই পারিবারিক কথ্য ভাষা ছিল উর্দু। এ ছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের সাধারণ জনগণেরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক এই ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারতো। তাই শাসকদল মুসলিম লীগ উর্দুকেই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন উঠার সাথে সাথেই পাকিস্তানের উভয় অংশে যারা ইতিপূর্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী এবং অখন্ড ভারতের পক্ষে হিন্দু

www.pathagar.com

কংগ্রেসের সমর্থক ছিল তারা এবার নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠে। তারা রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের আশায় দেশ বিভাগের সাথে সাথেই যথেষ্ট হৈ চৈ শুরু করে দেয়। এমন অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের জনক তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। তিনি ১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতার মাঝে উর্দুকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা হবে বলে মন্তব্য করেন। এ ছাড়া, ২৪শে মার্চ ঢাকার কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। সে সময় কায়েদ-ই-আযমের তুলনাহীন বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে কারও পক্ষে কোন ব্যাপারে প্রতিবাদ করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তবুও পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করে পাকিস্তানের কোন অংশের জনগনেরই কারও মাতৃভাষা নয় এমনি একটি হিন্দুস্থানী মুসলিম ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানী জনগনের উপর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালিয়ে দেবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠে উভয় সভাতেই। কায়েদ-ই-আযম তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন ভালভাবেই। তাই এ দু'সভা ছাড়া তৃতীয় কোন স্থানে বা সময়েই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর জীবদ্দশায় উর্দুর পক্ষে আর কোন কথাই বলেননি তিনি। এও শোনা গেছে যে, কায়েদ-ই-আযম রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ঢাকায় বসে উর্দুর পক্ষে যে মন্তব্য করেছিলেন তার জন্য তাঁর মৃত্যুর পূর্বে একাধিকবার আক্ষেপ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন।

যা হোক, ১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর কায়েদ-ই-আযম তাঁর মহান কর্তব্য পাকিস্তান হাসিলের কাজ শেষ করে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে, ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যথেষ্ট উত্তেজনা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঢাকায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক মুসলিম লীগ নেতাও এ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ইতিমধ্যে, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সরকারীভাবে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠিত হয় এবং দিন দিন এ বিতর্ক আরও ঘনীভূত হতে থাকে। এমনি এক অবস্থায় পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ঢাকার নওয়াব খাজা নাজিম উদ্দিন ঢাকায় পল্টন ময়দানে ১৯৫২ সনের ২৬শে জানুয়ারী এক জনসভায় আবারও মন্তব্য করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা। এবার তাঁর এ উক্তির বিরুদ্ধে দাবানলের মত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে চলতে থাকে প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ ও মিছিল। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির এক সভাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হবে এবং তখন ঢাকায় অনুষ্ঠানরত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা জনাব নূরুল আমীন। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি আহুত এ হরতালের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা হিসাবে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে যে কোন ধরনের সভা ও সমাবেশ

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সকালের দিকে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে সমস্ত প্রতিবাদমিছিল ও সমাবেশ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বিকেলের দিকে যখন ছাত্রজনতা আবার খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের দিকে যাচ্ছিল তখন ছাত্রজনতার একটি মিছিলের অগ্রযাত্রা লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেও যখন পুলিশ বন্ধ করতে পারতেছিল না এমনি এক অবস্থায় হঠাৎ করে গুলি বর্ষিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে পুলিশের এ গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার প্রমুখ শহীদ হন। এ ঘটনার পরে সারা পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। দলমত নির্বিশেষে জনগন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার পক্ষে ব্যাপক সভাসমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন এবং অবশেষে ১৯৫৬ সনে প্রবর্তিত পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র মারফত বাংলা ভাষাকে উর্দুর সাথে সমান্তরালভাবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

অকারণে অনেক বিতর্ক আর ঝগড়াফ্যাসাদের পরে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নেওয়া হল ঠিকই কিন্তু ইতিমধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের দু' অঞ্চলের মধ্যে যে ভুলবুঝাবুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি হলো তার সুদূরপ্রসারী ফল ও প্রতিক্রিয়া নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রটির অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে কঠিন আঘাত হেনে মারাত্মক ফাটল সৃষ্টি করলো যা পরবর্তীকালে দেশটির দ্বিধাবিভক্তির অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত হলো। পাকিস্তান শাসন করার ব্যাপারে শাসক মুসলিম লীগ সরকার যত ভুল করেছে তার মধ্যে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে এ অহেতুক বিতর্ক ও তিক্ততা সৃষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক ভুল। এ ভুলের যে কত চড়া মাশুল দিতে হবে তা তখন কেউ বুঝতে পারেনি।

স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তান পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়। এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানসহ চারটি প্রদেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল একটি মাত্র প্রদেশ যথা পূর্ব বাংলা ও আসামের কিয়দংশ। তবে পূর্ব পাকিস্তানে একটি মাত্র প্রদেশ থাকলেও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ ভাগই বাস করতো তখন পূর্ব পাকিস্তানে। তাই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের সাধারণ মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে কোন রকম বিতর্কের কোন অবকাশই থাকার কোন কারণ ছিল না। বিতর্কের যদি কিছু থেকে থাকতো তা হলে তা থাকা উচিত ছিল, উর্দুকে ধার করে এনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কোন প্রশ্ন উঠে কিনা তাই। কারণ উর্দু পূর্ব পাকিস্তান তো নয়ই, এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের কোনটির জনগণেরই মাতৃভাষা ছিল না, যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত মাত্র ৪৫ ভাগ লোকের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যার সাধারণ কথ্য ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হত এ ভাষাটি। উর্দু

www.pathagar.com

ছিল হিন্দুস্থানের উত্তর ভারতের মুসলিম জনগনের সাধারণ মাতৃভাষা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পরেও কংগ্রেস নেতারা তথা উপমহাদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও জনগোষ্ঠী নব্য মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহন করতে পারেনি বা মনেপ্রাণে এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়নি। দেশ বিভাগের পর পরই কুমিল্লার তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস দলীয় বিশিষ্ট মুসলিম নেতা আশরাফ আলী সাহেবের কাছে লেখা কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এক পত্রে এই বলে সান্তনা ও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলাকে ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান করার ক্ষত মুছে ফেলা হবে এবং দু' বাংলা আবার এক হয়ে যাবে। তাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দুস্থানী কংগ্রেস নেতারা এবং এ দেশে বসবাসরত তাদের দোসর ও সেবাদাসরা এবার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আবার দু' বাংলাকে এক করার নামে পূর্ব বাংলাকে হিন্দুস্থানের উপনিবেশ ও শোষনের ক্ষেত্র হিসাবে তৈরী করার কাজে সক্রিয় হয়ে উঠার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই ১৯৫২ সনে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলায় কিছু গোলমাল ও বিতর্কের সূত্রপাত হলেও ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে যখন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দেওয়া হল তারপরেও প্রতি বছর ঘটা করে পূর্ব পাকিস্তানে এ বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপন করার কি দরকার বা কারণ থাকতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। বিশেষ করে, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিস্বরূপ যে শহীদ মিনারটি নির্মান করা হল তাতে মুসলিম স্থাপত্য বা ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে বিজাতীয় হিন্দু ভাবধারা ও স্থাপত্যের প্রাধান্য দেয়ার কি কারণ ছিল আমরা জানি না। এ ছাড়া, অদ্যাবধি প্রতি বছর যে পদ্ধতিতে এ দিবসটি পালন করা হয় তা আদৌ কোন মুসলিম রীতি-নীতি নয়। সারা দেশে এবং বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যে ভাবে আলপনা এঁকে ফুল-চন্দন দিয়ে শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনার নামে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয় তা মোটেই মুসলিম বা ইসলামী রীতি-নীতি বা ঐতিহ্যের ধারে-কাছেও নয়; বরং এ সমস্ত কাজগুলি, কেন জানি না, করা হয় ইসলামী রীতি-নীতি বিরোধী বিজাতীয় হিন্দু নিয়ম ও প্রথা অনুসারেই। অথচো, ভাবতে অবাক লাগে যে, মহান ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুসলমানের সন্তান মুসলমান। কোন হিন্দুই এ আন্দোলনে মারা যায়নি। তাই আমরা মনে করি যে, শহীদ দিবস পালনের নামে বিজাতীয় প্রথা আমদানী করার মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অমর বীর শহীদদের রূহের কষ্ট দেয়ার বা তাদের এ মহান কোরবানীর প্রতি এ ভাবে ব্যঙ্গ করার কোন অধিকার কারো নেই। অবিলম্বে এ ইসলাম-বিরোধী প্রথা বন্ধ করে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধিবিধান অনুসারে এ বিশেষ মহান দিবসটি উদ্‌যাপন করা উচিত। সরকারের অবশ্যই এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

মহান শহীদ দিবস ও ভাষা আন্দোলনকে উপমহাদেশের হিন্দু নেতারা বা হিন্দুস্থান কি ভাবে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার হাতিয়ার হিসাবে লুফে নিয়েছিল তার আরেকটি প্রকৃষ্ট প্রমান হচ্ছে, ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনের পরে ১৯৫৬ সনে বাংলা পাকিস্তানের

www.pathagar.com

অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরেও সেই থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মতই এ দিবসটি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসাবে প্রতি বছর একই কায়দায় একই ঢংয়ে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। অথচো, অতীব আশ্চর্য ও হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় অদ্যাবধি বাংলা ভাষাকে হিন্দুস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন আন্দোলন তো দূরের কথা, টু শব্দটি পর্যন্তও হয়নি। অথচো, বাংলা ভাষা ১৯৫৬ সনেই পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৭১ সনে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আঃ! মরি! মরি! পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের কত দরদ পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য! মায়াকান্না আর কাকে বলে! এ যেন, মায়ের চেয়ে খালার দরদ বেশী।

সে যাই হোক, মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সুকৌশলে পাকিস্তান বিরোধীরা যে সার্থকভাবে তাদের মহান ব্রত পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় বেশ সার্থকতার সাথে শুরু করেছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

ছয়

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান আজাদী লাভের পরে কতিপয় সমস্যা ও অনভিপ্রেত ঘটনা নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটিকে কিছুটা বেকায়দায় ফেললেও দুনিয়ার বৃহত্তম এ মুসলিম রাষ্ট্রটির শাসক দল মুসলিম লীগের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নির্ভেজাল দেশপ্রেম এবং জনসাধারনের আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহনের ফলে সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে দেশটি উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিন্দুস্থানী শাসকদল কংগ্রেস পাকিস্তানকে জন্মের সাথে সাথেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য উপমহাদেশের স্বাধীনতা-দলিলের শর্তানুসারে পাকিস্তানের প্রাপ্য ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করে। তাই দেশ বিভাগের পরে যখন মুষ্টিমেয় মুসলিম সরকারী চাকরীজীবী কর্মচারী ও অফিসার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এসে নতুন দেশটির প্রশাসনিক কাজে হাত দেন তখন যে কি অসুবিধার ভিতর তাদের কাজ করতে হয়েছে তা বলে বুঝানো মুশকিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তখনকার দিনে উপমহাদেশে সরকারী কাজে মুসলমান কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। তার মধ্যে আবার উচ্চতর সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। তখন পর্যন্তও চাকরী ও ব্যবসাবাণিজ্য ছিল প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের দখলে। তাই স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে বিশেষ করে যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু কর্মচারীগণ পশ্চিমবঙ্গে তথা হিন্দুস্থানে চলে যায় তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসনিক কাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে তখনকার মুসলিম লীগ দলীয় সরকারকে বেশ বেগ পেতে হয়। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের শাসন ব্যবস্থাকে বিকল করে দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে এ দেশের সমস্ত হিন্দু কর্মচারীরা একযোগে সহসাই দেশ ত্যাগ করে। এর ফলে, সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের শিক্ষা বিভাগ কারণ তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল শিক্ষকই ছিল হিন্দু। তাই তারা সবাই একত্রে দেশত্যাগ করার ফলে স্বাধীনতার পরে এ দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাধিক বছর বন্ধ থাকে।

এমনি এক মারাত্মক শূন্যতা ও দৈন্যতার ভিতরেই সামান্য সংখ্যক মুসলিম সরকারী কর্মচারী ও অফিসার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় বসে নতুন করে নতুন দেশটির প্রশাসনিক কাজ শুরু করেন। তখন তাদের না ছিল টেবিল-চেয়ার, না ছিল ফাইলপত্র বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র। এমনকি, সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের বসার মত দালান-কোঠা বা অফিস-আদালতও ছিল না। আলপিনের অভাবে খেজুর, বেল ও বাবলা কাঁটা দিয়ে কাজ করা হতো। মোটকথা, সে ছিল এক সাংঘাতিক করুন অবস্থা, চোখে না দেখলে যা বলে বিশ্বাস করানো মুশকিল। সে ছিল যেন বিধ্বস্ত এক জনপদকে নতুন করে পুনর্বাসিত করার কাজ। তবুও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত এ দেশের সরকার, সরকারী কর্মচারী ও জনগনের সার্বিক সহযোগিতা ও

www.pathagar.com

ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সমস্ত প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে পাকিস্তান দিন দিন ব্যাপক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

পাকিস্তান যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণভাবে কোন কল-কারখানা ছিল না বল্লেই চলে। তখন এখানে শিল্পকারখানা বলতে মাত্র চারটি বস্ত্রকল ও দুইটি চিনির কল ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তখনকার দিনে দুনিয়ার উৎপাদিত সমস্ত পাটের প্রায় ষাট ভাগ সর্বোৎকৃষ্ট জাতের পাট উৎপন্ন হতো। কিন্তু এখানে পাটকল ছিল না একটিও। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত পূর্ববাংলা ছিল পশ্চিমবাংলা তথা কলিকাতার বিভিন্ন শিল্পকারখানার কাঁচা মালের সরবরাহকারী পশ্চাদভূমি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে অল্পদিনের ভিতরেই ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জের আদমজী নগরে স্থাপিত হয় দুনিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল। এ ছাড়াও, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয় আরো বহু পাটকল, বস্ত্রকল ও চিনিকলসহ বিবিধ আধুনিক কল-কারখানা।

ইতিমধ্যে, রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটে ও তদস্থলে এখানে যুক্তফ্রন্ট দলীয় সরকার গঠিত হয়। এ ছাড়া, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে পাকিস্তানে যে জটিলতা ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তারও নিরসন হয় এবং ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে দেশে বিরাজমান সমস্ত অচলাবস্থার অবসান ঘটে। দেশে মোটামুটি স্থিতিশীলতা বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পাকিস্তানে প্রবর্তিত মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা ভালভাবে কাজ করতে পারতেছিল না। এমনি এক অবস্থায় ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আসেন। সামরিক আইন জারি করেই আইয়ুব খান দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও দুর্ণীতি দমনের পদক্ষেপ গ্রহন করেন। ১৯৬২ সনে তিনি পাকিস্তানের জন্য প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেশে আবার গণতন্ত্র কায়েম করেন।

ক্ষমতায় আসার পর পরই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন। সারাদেশে উন্নয়নের জোয়ার বইতে থাকে অতি দ্রুত গতিতে। দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠতে থাকে অসংখ্য কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, দালান-কোঠা ও রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে নিত্য নতুন শহর, বন্দর ও শিল্পনগরী। এককথায় বলতে গেলে, এ সময় পাকিস্তানে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে আজ বত্রিশ বছর। অথচো, আজ পর্যন্ত দেশে যত কল-কারখানা, রাস্তাঘাট ও দালান-কোঠা দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কমপক্ষে হলেও অন্ততঃ শতকরা আশিভাগ তৈরী হয়েছে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ দলীয় নেতা দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের মাত্র দশ বছরের শাসনামলে। জাতির দুর্ভাগ্য যে, পাকিস্তান আমলে এবং বিশেষ

www.pathagar.com

করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের শাসনকালে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলিও আজ বাংলাদেশ সরকার সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষা করতে পারছে না। এটা সত্যিই বড় পরিতাপের বিষয়।

পাকিস্তানের সর্বত্র যখন এমন উন্নয়নের জোয়ার বইছিল তখন এ অবস্থাদৃষ্টে উপমহাদেশের মুসলমানদের চিরশত্রু চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রাহ্মন্যবাদী শক্তি তথা হিন্দুস্থানের গাত্রদাহ শুরু হয়। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে দেশের দু'অঞ্চলের ভিতর যে ভুলবুঝাবুঝি, তিক্ততা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে করে হিন্দুস্থান ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার যে দুঃস্বপ্ন দেখতেছিল এবং তলে তলে পাকিস্তান-বিরোধী শক্তিগুলোকে যে আশায় মদদ যোগাচ্ছিল তাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই হিন্দুস্থান এবার একটু বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং ১৯৬৫ সনের জুন মাসে সহসা অতর্কিতে বিনা কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চলের কচ্ছের রান এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমানা লংঘন করে পাকিস্তান আক্রমন করে বসে। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী পাকিস্তানী জোয়ানদের পাল্টা হামলার মুখে হিন্দুস্থানী সৈন্যরা প্রায় আশি মাইল হিন্দুস্থানী এলাকা ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনাটা হিন্দুস্থানের কাছে বেশ বেইজ্জতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারন, ইতিপূর্বে ১৯৬২ সনে গণচীনের সাথে এক সীমান্ত যুদ্ধেও হিন্দুস্থানী সৈন্যরা এমনি মাত্র কয়েক দিনের সংঘর্ষে ব্যাপক এলাকা চীনা বাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে এসেছিল। তাই পর পর এ দুই সীমান্ত সংঘর্ষে চরম মার খেয়ে হিন্দুস্থানী সরকার ও সমরনায়কগণ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং এ লজ্জা ঢাকার জন্য সুযোগের সন্ধান করতে থাকেন। এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ছ'তারিখ হঠাৎ করে হিন্দুস্থান আবার পাকিস্তান আক্রমন করে বসে। ইতিপূর্বে দু'বার পাকিস্তানের কাছে এবং একবার গণচীনের কাছে মার খেয়ে হিন্দুস্থান বিশ্বে ও নিজ দেশে তার সৈন্যবাহিনী ও সামরিক সরঞ্জামাদির ব্যাপারে যে অবিশ্বাস ও দুর্নাম কুড়িয়েছিল এবার সহসা রাতের অন্ধকারে কাপুরুষোচিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর ও শিয়ালকোট সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমানা লংঘন করে পাকিস্তানকে ঘায়েল করে দিয়ে সে দুর্নাম ঘুচাবার ও সুনাম কুড়াবার আশায় হিন্দুস্থান এ মরণকামড় দেয়। রাতের অন্ধকারে হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তৎকালীন হিন্দুস্থানী প্রধান সেনাপতি জেনারেল চৌধুরী ৬ই সেপ্টেম্বর রাতে সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, পরদিন ৭ই সেপ্টেম্বর তারা লাহোরের ঐতিহাসিক শালিমার বাগে প্রাতঃরাশ করবেন। কিন্তু বিধি বাম। চৌধুরী বাবুর সে সাধ আর পূর্ণ হলো না। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পাল্টা হামলার মুখে হিন্দুস্থানী সৈন্যরা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বুঝতে পারে যে, উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম উত্থান-পতনের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী অতি প্রাচীন নগরী লাহোরের মনোরম বাগান শালিমার বাগে বসে পরদিন প্রাতে আনন্দ-ফুর্তির মাঝে গলা ভিজিয়ে নেয়ার মধুর খায়েশ অচিরেই মিটে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

কচ্ছের রানে মার খেয়েও হিন্দুস্থানী জেনারেল বাবু পাকিস্তানী বাহিনীর শৌর্য-বীর্য ও সামরিক মান সম্পর্কে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারেননি। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি বা তাঁর কর্তাবাবুরা জানলেও, বোধহয়, তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে কে তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বৃটিশ সামরিক একাডেমী স্যান্ডহার্স্টের গ্রাজুয়েট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহনকারী কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক অফিসার অসীম সাহসী বীর সুদক্ষ সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী কর্তৃক রাতের অন্ধকারে তস্করের মত কাপুরুষোচিতভাবে পাকিস্তান আক্রমণের খবর শুনার সাথে সাথে পাক জোয়ানদের প্রতি তাদের মাতৃভূমি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার নামে শাহাদাৎ বরণের আহবান জানিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং নিজে কন্ট্রোলরুমে গিয়ে দিবারাত্রি যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহন করেন। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। হিন্দুস্থানী সৈন্যদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দেয়া হল। এর পরে পাকিস্তানী বাহিনীর জানকবুল প্রতিরোধ ও পাল্টা হামলার মুখে হানাদার বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ যুদ্ধে হিন্দুস্থান তার নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও শেষ পর্যন্ত আক্রমণের প্রথম রাত্রে যে সামান্য পাকিস্তানী সীমান্ত অংশটুকু কব্জা করে নিয়েছিল তারপরে আর নতুন কোন এলাকা বা ভূখন্ড দখল করতে সমর্থ হয়নি। বরং সতের দিনের এ যুদ্ধে হিন্দুস্থান তার এক উল্লেখযোগ্য এলাকা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে ছেড়ে দিয়ে পিছু হঠে যেতে বাধ্য হয়। কয়েক হাজার ট্যাঙ্ক সমর্থিত হিন্দুস্থানী বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য পাকিস্তানী জোয়ানরা সে দিন যে শৌর্য-বীর্য ও অসীম সাহসিকতাপূর্ণ ঈমানী যোশ প্রদর্শন করেছিল তা এ দেশের মানুষ বা হিন্দুস্থানী যুদ্ধবাজরা কোনদিনও ভুলতে পারবে না। শিয়ালকোট সেক্টরে হিন্দুস্থানী সৈন্যদের অগ্রবর্তী ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগ্রাভিযান থামিয়ে দেয়ার জন্য জানবাজ পাক বাহিনীর অকুতভয় ও নির্ভিক জোয়ানদের শাহাদাৎ বরণের মধ্য দিয়ে যে বিজয় সে দিন অর্জিত হয়েছিল তা বহুযুগ ধরে উপমহাদেশের মুসলিম সামরিক শক্তির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সে দিন যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে, শুয়ার-কুকুরের মৃতদেহের মত হানাদার হিন্দুস্থানী সৈন্যদের অসংখ্য লাশে ভরে আছে সমস্ত যুদ্ধ ময়দান। যুদ্ধে পাকিস্তানী জোয়ানরা যে শহীদ হননি তা নয়। এ যুদ্ধে জোয়ানদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী সংখ্যক পাকিস্তানী সেনাঅফিসার শাহাদাৎ বরণ করেন। হিন্দুস্থানের সাথে এ যাবৎ সংগঠিত প্রতিটি যুদ্ধেই এ চিত্রটি ধরা পড়ে। আর এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, পররাজ্যলোলুপ হিন্দুস্থানী বাহিনীর প্রাণভয়ে ভীত হিন্দু অফিসারগণ সাধারণ সৈন্যদের শত্রুর কামানের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা যতদূর সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। আর অন্যদিকে, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মুসলমান অফিসারগণ যুদ্ধে শহীদী মর্যাদা লাভের জন্য যে কোন আক্রমন বা প্রতিআক্রমণের সময় জোয়ানদের প্রতি নির্দেশ দানের সাথে সাথে জোয়ানদের

www.pathagar.com

পাশাপাশি নিজেরাও রণক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কেননা, হিন্দুরা মনে করে যে, যুদ্ধে বা অন্য যে কোন ভাবেই হোক একবার মারা গেলে তাদের মহামূল্যবান মানবজন্ম বিফল হয়ে গেল। আর অন্যদিকে, একজন মুমীন বা সত্যিকার মুসলমান মনে করেন যে, মাতৃভূমির জন্য বা অন্য যে কোন ভাবে জাতির জন্য শাহাদাৎ বরণ করতে পারলে সে শহীদ হয়ে যাবে ও তার মানবজন্ম সার্থক বা ধন্য হয়ে যাবে এবং পরজীবনে অনন্তকাল সে জান্নাতবাসী হবে বা মহাসুখে থাকবে। মুসলিম জাতি বা ইসলাম ধর্মের জন্য যুদ্ধে বা জেহাদে অংশ নিয়ে শহীদ না হয়ে গাজী বা বিজয়ী হলেও একজন মুমীন বা খাঁটি মুসলমান ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই ধন্য বা সফলকাম হবে বলে ধর্মীয়ভাবেই বিশ্বাস করে। তাই সংগ্রামে বা জেহাদে অংশ নিতে বা শহীদ হতে একজন সত্যিকার মুসলমান বা মুমীন কোনদিনই সামান্যতম ভয়ও পায় না, বরং এতে করে সে গর্ববোধ করে ও প্রচুর আনন্দ পায়। এটাই স্বাভাবিক, এটাই ইসলামী শিক্ষা এবং এটাই ইসলামী আদর্শ।

সতের দিনের এ যুদ্ধে হিন্দুস্থান নৌ, বিমান ও স্থল ক্ষেত্রের সর্বত্রই পাকিস্তানীদের হাতে চরম মার খায় এবং পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশী জায়গা হারায়। তাই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবার কিছুদিনের ভিতরেই হিন্দুস্থান তার বন্ধু বিশ্বমুসলিম ও ইসলামের জঘন্য শত্রু সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় "তাসখন্দ চুক্তি"র মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেয়। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে পাক সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানী তথা বাংলাদেশী জোয়ানরা যে শৌর্য, বীর্য ও অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তাতে করে বৃটিশদের দেয়া ভেতো ও ভীত বাঙ্গালী অপবাদ দূর হয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী তথা বাংলাদেশী মুসলিম জোয়ানদের ব্যাপারে পাকিস্তানে এক নতুন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের পরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে এতদিন পর্যন্ত সঙ্কুচিতদ্বার পুরোপুরিভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য খুলে দেয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিনের ভিতর পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানী জোয়ান ও অফিসার সংগ্রহ দিন দিন নিত্য নতুন হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লাহোর রণাঙ্গনে হিন্দুস্থান যে অতর্কিতে পাকিস্তান আক্রমন করেছিল তার কারণ হিসাবে হিন্দুস্থানী শাসকরা বলেছিল যে, কাশ্মীরে সে সময় যে হিন্দুস্থান-বিরোধী আন্দোলন ও যুদ্ধ চলছিল তার পিছনে পাকিস্তানের সক্রিয় হাত ছিল এবং কাশ্মীরীদের আক্রমন ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েই হিন্দুস্থান তার সুবিধামত সময়ে সুবিধামত জায়গায় পাকিস্তানকে ঘায়েল করে শিক্ষা দেয়ার জন্যই এ আক্রমন পরিচালনা করেছিল। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার যে, ১৯৪৭ সনে যখন দেশ বিভক্ত হয় তখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দলিলের শর্তানুসারে যে সমস্ত অঞ্চল নিয়ে সরাসরি পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান গঠিত হয়, তার বাইরে তৎকালীন বৃটিশ ভারতে এমন কতকগুলি বৃটিশ অনুগত তথাকথিত স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল যাদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, এ সমস্ত দেশীয়

www.pathagar.com

রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের তথা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান যে কোন রাষ্ট্রে বিনা বাধায় যোগদান করতে পারবে। কিন্তু দেশ ভাগ হবার পরপরই হিন্দুস্থান সমস্ত রীতিনীতি ও আদর্শের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে একে একে জোর করে জুনাগড়, মানভাদার, গোয়া, দমন, দিউ সমেত মুসলিম শাসক-শাসিত হায়দ্রাবাদ ও হিন্দুরাজা-শাসিত শতকরা আশিভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর দখল করে নেয়। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে পাকিস্তানের কোন সীমান্ত ছিল না। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের সাথে পাকিস্তানের সীমান্ত থাকায় সেখানকার মুসলিম জনসাধারণ ডোগরা হিন্দুরাজার সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের এ জবরদখলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সীমান্তবর্তী পাকিস্তানী উপজাতীয় মুসলমানগণও যুদ্ধে কাশ্মীরী মুসলিম ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিছুদিনের মধ্যেই এই সম্মিলিত মুজাহিদ বাহিনী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা হিন্দুস্থানী সৈন্যদের কাছ থেকে দখল করে নিয়ে গোটা রাজ্যটি আজাদ করার পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায়, হিন্দুস্থান বেকায়দা দেখে জাতিসংঘের শরনাপন্ন হয়ে কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছানুযায়ী তাদের ভাগ্যনির্ধারণের জন্য গণভোটের প্রস্তাব দিয়ে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানায়। বিশ্বসংস্থার মধ্যস্থতায় এ গণভোটের প্রস্তাবে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির আহবান মেনে নেয় এবং কাশ্মীরে মুজাহিদদের অগ্রাভিযান বন্ধের নির্দেশ দেয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, চানক্য কূটনীতির অনুসারী ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থানী শাসকগোষ্ঠী তাদের পরাজয় ঠেকিয়ে দেয়ার পরে অদ্যাবধি তাদের জবরদখল করা কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি ছেড়ে দেয়নি বা কাশ্মীরী জনগণকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের ভাগ্যনির্ধারণের উদ্দেশ্যে তার দেয়া প্রস্তাব হিন্দুস্থান জাতিসংঘের অসংখ্য তাগাদার পরেও আজ পর্যন্ত কার্যকর করতে রাজী হয়নি। ১৯৪৭ সন থেকে আজ পর্যন্ত কাশ্মীরী জনগণ জবরদখলকারী বর্বর হিন্দুস্থানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

এ সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি জবরদখল করার সময় হিন্দুস্থান এক একটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও খোঁড়াযুক্তি প্রদর্শন করেছে। এ জবরদখলের ব্যাপারে হিন্দুস্থানী নীতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ও স্ববিরোধী। হায়দ্রাবাদসহ কতিপয় রাজ্য দখলের সময় হিন্দুস্থান জনগণের ইচ্ছার দোহাই দেয়; আবার জম্মু ও কাশ্মীরসহ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য দখল করার ব্যাপারে হিন্দুস্থান সেখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্যগুলির হিন্দু শাসকদের মতামতের কথা তুলে। আসলে, তার কার্যহাসিলের জন্য হিন্দুস্থান যখন যা ভাল মনে করেছে তাই বলেছে বা ওয়াদা করেছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে হিন্দুস্থানী শাসকরা সামগ্রিকভাবে কোন ন্যায়নীতি বা আদর্শের তোয়াক্কা করেনি বা ধার ধারেনি। এটাই হিন্দুস্থানী সরকার বা শাসকগোষ্ঠীর আসল ও বিশেষ চরিত্র।

যা হোক, ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে পাকিস্তানের কাছে চরম পরাজয় বরণ ও বেদম মার খাবার পরে হিন্দুস্থানী শাসকগোষ্ঠী ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারে যে, যুদ্ধে

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। হিন্দুস্থানী নেতাদের বুঝতে আর বাকী থাকে না যে, অতীতের মত উপমহাদেশের মুসলিম শক্তি আজও তাদের জন্য অজেয়। সুতরাং, গায়ের জোরে নয়, ছলের বলে বা কূটকৌশলেই পাকিস্তানকে ঘায়েল করতে হবে। তাই এরপর থেকে হিন্দুস্থান নোংরা পথেই পা বাড়ায় এবং পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশে তার পুরাতন বন্ধুদের সাথে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন করে ও নতুন বন্ধুর সন্ধানে মনোনিবেশ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্থান অচিরেই তার দোসর খুঁজে পায় এবং তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে।

www.pathagar.com

সাত

হিন্দু নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরামহীন একগুঁয়েমী ও অনমনীয় মনোভাবের দরুন যখন একটি সর্বভারতীয় একক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান নামে দু'টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে উঠে তখন বাংলাদেশের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে থেকে অন্ততঃ বাংলা ও আসাম অঞ্চল নিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহন করেন এবং জোর প্রচেষ্টা চালান। তথাকথিত এ বৃহৎবাংলা বা যুক্তবাংলা আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মুসলিম লীগ নেতা জনাব আবুল হাশিম, কৃষক প্রজা পার্টি নেতা জনাব এ.কে. ফজলুল হক এবং উদারপন্থী হিন্দু নেতা শরৎ বোসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বহু মুসলিম লীগ দলীয় নেতাও শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের পক্ষে চলে গেলে দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতা কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের তরফ থেকে এ যুক্তবাংলা আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং এর হিন্দু নেতৃবৃন্দ গোড়া থেকেই এ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে। যে কংগ্রেস এবং তার হিন্দু নেতারা ১৯০৫ সনে বঙ্গ বিভক্ত হয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নতুন একটি প্রদেশ গঠিত হবার পরে তাদের ভারত-মাতাকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে বলে ব্যাপক সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবিভাগ বানচাল করে দিয়েছিল, সেই কংগ্রেস এবং তার হিন্দু নেতারাই এবার বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রধানতঃ এতদঞ্চলের মুসলিম নেতাদের একটি শুভ ও মহৎ প্রচেষ্টাকে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের প্রাদেশিক আইন-সভার হিন্দু সদস্যদের সাম্প্রদায়িক ভোটের মাধ্যমে মুসলিম নেতাদের জোর আপত্তির মুখে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে নস্যাৎ করে দেয়। বৃহৎবাংলা গঠনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের চরম বিরোধিতার প্রধান কারণ, বোধহয়, এটাই ছিল যে, প্রস্তাবিত এ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রটির জনসংখ্যার বিচারে মুসলমানগণই ছিল নামেমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই উপমহাদেশে এক পাকিস্তানকেই যারা মানতে চাচ্ছিল না, তারা বৃহৎবাংলার নামে দু'টি পাকিস্তানকে সহ্য করে কি করে! যদিও ১৯৭১ সনে আবার কংগ্রেস ও এর হিন্দু নেতারাই তথা হিন্দুস্থানী শাসকরাই তাদের কূটকৌশল বাস্তবায়নের এক পর্যায় হিসাবে এ নীতিই গ্রহন বা সমর্থন করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

১৯৪৭ সনে অখন্ড বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন বাংলায় বিশ্বাসী নেতা ও কর্মীগণ তাদের অন্তর হতে সে স্বপ্নকে কোনদিনও মুছে ফেলেননি। বরং তারা

www.pathagar.com

তাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় সযত্নে লালিত এ সপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার মাত্র ১৭ দিন পরে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দানের জন্য "তমদ্দুন মজলিস"সহ বিভিন্ন কমিটি গঠিত হতে থাকে। এটা সত্য যে, তমদ্দুন মজলিশের নেতৃত্বে আন্দোলনটি শুরু হলেও পাকিস্তানের বৃহত্তর ঐক্য বিনষ্ট করা নয়, বরং শক্তিশালী করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তবে আন্দোলনটি তাঁরা ধরে রাখতে না পারায় ক্ষমতালিপ্সু হিন্দুস্থানী ক্রীড়নকদের নেতৃত্বে এটি ক্ষতিকর ধারায় প্রবাহিত হয়। এ সমস্ত কারণেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফাঁকে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। আর এ জন্যই ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র মারফত বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের পরেও এক শ্রেণীর লোক প্রতি বছর ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই রাষ্ট্রভাষা দিবসটিকে বেশ ঘটা করে উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করে। এ দিবসটি পালনের জন্য যে সমস্ত আয়োজন করা হয় তা মোটেই পাকিস্তানী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অনুসারী বা পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য একেবারেই অনুকূল ছিল না। প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারী যা করা হয় তা ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে এর বিপরীতে একটি ইসলাম-বিরোধী ও মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দুঘেঁষা ভাবধারা ও চেতনারই জন্ম দেয়।

এতসবের পরেও এ কথা বলা অবশ্যিই অসঙ্গত হবে না যে, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষা স্বীকৃতি পাবার পরে পাকিস্তান-বিরোধী ও স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শে বিশ্বাসী নেতা ও ব্যক্তিবর্গ তেমন সুবিধা করতে পারতেছিলেন না। যদিও তারা মাঝে-মধ্যে প্রায়ই পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলে এর মাধ্যমে জোর আন্দোলনের চেষ্টা করতেন কিন্তু তা জনগণের কাছে তেমন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। কারণ, এ সমস্ত কথাবার্তা বা আন্দোলনের প্রশ্ন উঠলেই পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ একে পাকিস্তান-বিরোধী হিন্দুস্থানী অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র বলে এ আন্দোলনকে কোনঠাসা বা অবদমিত করে দিত। শাসক দল মুসলিম লীগ জনগণকে বার বার এ কথাই বুঝাতে চেষ্টা করতো যে, ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির সময়েই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহন করে ক্রমশঃ দূর করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এমনি এক অবস্থার মাঝে যখন ১৯৬৫ সনে হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তানের ১৭ দিনের এক সংক্ষিপ্ত অথচ ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে গেল তখন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা শেখ মজিবর রহমান এই বলে জোর আওয়াজ তুললেন যে, যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান একেবারেই অরক্ষিত ছিল এবং হিন্দুস্থান ইচ্ছে করলেই পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারতো। তাই তিনি তাঁর দলের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য

www.pathagar.com

অনেক অধিক মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন আঞ্চলিক সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনারও দাবি তুলেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বিষয়টি হচ্ছে, আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ১৯৫৮ সনে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় আসার পরেই আইয়ুব খান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার ফলে মাত্র দশ বছরে পাকিস্তানে প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। এ সময়ে পাকিস্তান বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এক আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। গোটা পাকিস্তানে অতি দ্রুতগতিতে উন্নয়নের জোয়ার বইতে থাকে। দেশবিদেশের মানুষ পাকিস্তানের এ ব্যাপক ও দ্রুতউন্নয়নে মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের পরেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ব্যাপক মতবিরোধ ও দ্বন্দের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে তাঁর শাসনের অবসান ঘটায় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলে। এর প্রধান এবং, বোধহয়, একমাত্র কারণ ছিল, ক্ষমতায় এসেই আইয়ুব খান বহুদিন থেকে এ দেশে প্রচলিত পার্লামেন্টারী তথা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার অবসান করে তদস্থলে প্রেসিডেন্সিয়াল তথা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করেন। বহু বছর বৃটিশদের গোলামী করার পরে ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীন হলেও এ দেশের মানুষ তাদের বহুদিনের প্রভু ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকার মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই তারা পাকিস্তানের মত একটি অর্ধশিক্ষিত বা প্রায়-অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী-সমৃদ্ধ দেশে বৃটিশ ধাঁচে একটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের চেয়ে বরং অনেক বেশী উপযোগী ও কল্যানকর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বিরুদ্ধে অগনতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী অপবাদ দিয়ে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও গণ-অসন্তোস গড়ে তোলার প্রয়াস পান।

প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের নিজস্ব রাজনৈতিক দল কনভেনশন মুসলিম লীগ ছাড়া পাকিস্তানের প্রধান প্রধান সমস্ত রাজনৈতিক দলই আইয়ুব খান প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা এবং বিশেষতঃ তাঁর প্রবর্তিত "মৌলিক গণতন্ত্র" ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনে শরীক হয়। কিন্তু এতসবের পরেও ১৯৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিপুল ভোটের ব্যবধানে পাকিস্তানের জনক কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র কনিষ্ঠ বোন এবং সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী কায়েদ-ই- মিল্লাত মোহ্‌তারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে পরাজিত করে দ্বিতীয় বারের মত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

দেশে বিরাজমান এমন এক পরিস্থিতির মাঝে ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে ১৯৬৬ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক নগরী লাহোরে পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের আলোচ্যসূচী নির্ধারনের জন্যে গঠিত প্রস্তুতি-কমিটির সভায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবর রহমান এক "ছয়দফা" কর্মসূচী পেশ করেন। আইয়ুব-সরকার বিরোধী তথাকথিত এই সর্বদলীয় সম্মেলন-প্রস্তুতি কমিটির আলোচ্যসূচীতে যদিও শেখ মুজিব কর্তৃক পেশকৃত এ কর্মসূচী গৃহীত হয়নি তবুও ১১ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এ কর্মসূচী জনসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে ইহাই তথাকথিত ঐতিহাসিক "ছয়দফা" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। শেখ মুজিব কর্তৃক প্রদত্ত ছয়দফার মূল কথা ছিল নিম্নরূপ।

১। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলি হবে সার্বভৌম।

২। ফেডারেল সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধুমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া সমস্ত বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।

৩। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র দু'টি ষ্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে বিনিময়যোগ্য দু'টি স্বতন্ত্র মুদ্রা থাকবে। নতুবা, একটি কেন্দ্রীয় ষ্টেট ব্যাংকের অধীনে দু'টি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনাধীন একই মুদ্রা চালু থাকবে এবং সাথে সাথে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মুদ্রা ও মূলধন পাচার বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে।

৪। সমস্ত কর ও খাজনা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারকে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রতি বছর প্রদান করবে।

৫। বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে আঞ্চলিক সরকারগুলির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে যুক্তিযুক্ত হারে প্রাদেশিক সরকারগুলি বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দিবে।

৬। আঞ্চলিক সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলিকে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনার ক্ষমতা দিতে হবে।

শেখ মজিবর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ছয়দফা কর্মসূচী পর্যালোচনা করলে এটা বুঝতে কারো বাকী থাকার কথা নয় যে, এ নীতিসমূহ বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তান আর একটি ফেডারেল রাষ্ট্র থাকে না। এর দ্বারা যা বস্তবায়িত হয় তা হচ্ছে, একটি অখন্ড পাকিস্তান ভেঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তান নামে একটি কনফেডারেশন গঠন করাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাসনতান্ত্রিকভাবে মেনে নেয়া। এ রূঢ় বাস্তব সত্যকথাটি শেখ মজিবর রহমান হয় ভয়ে না হয় অন্য কোন বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে সরাসরি বলতে পারেননি।

www.pathagar.com

লাহোরে অনুষ্ঠিত সরকার-বিরোধী সর্বদলীয় সম্মেলনের আলোচ্যসূচীতে ছয়দফা প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় শেখ মজিবর রহমান উক্ত সম্মেলন বর্জন করে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৬৬ সনের মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর এ ছয়দফা কর্মসূচী পাশ করিয়ে নেন। এরপর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা ও স্থানসমূহে সভা ও সমাবেশ করে জনগনের কাছে তাঁর এ প্রস্তাবাবলী গ্রহনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর এ সব আবেদনে প্রথম দিকে জনগণ মোটেই উৎসাহ প্রদান করেনি। অন্য দিকে, সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনসভাতে শেখ সাহেবের দেয়া বিভিন্ন রকম বক্তৃতা-বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক রাষ্ট্র ও সরকার-বিরোধী মামলা দায়ের করেন এবং কয়েকজন দলীয় কর্মী ও নেতাসহ শেখ মজিবর রহমানকে গ্রেফতার করেন। এ সময় দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দিয়ে সরকার পত্রিকাটির সম্পাদক আওয়ামী লীগ নেতা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকেও গ্রেফতার করেন। এ পর্যায়ে ছয়দফা আন্দোলন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

এ অবস্থায় ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান সরকার শেখ মজিবর রহমানকে প্রধান আসামী করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৩৫ জন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পাকিস্তানের আজন্ম শত্রু হিন্দুস্থানের সাহায্যে শেখ মজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগড়তলায় এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করেন। একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে হাইকোর্টের বিচারপতিদের সমন্বয়ে ঢাকার কুর্মিটোলা সেনানিবাসে এ মামলার শুনানী ও বিচার কাজ চলতে থাকে। আওয়ামী লীগের পক্ষে মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশী আইনজীবীদের সহায়তা ও উপদেশ দেয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ইংরেজ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

আওয়ামী লীগের তরফ হতে গোড়া থেকেই আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলাকে একটি মিথ্যা ও বানোয়াট ষড়যন্ত্রমূলক মামলা হিসাবে আখ্যায়িত করে এতে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ পুরোপুরিই অস্বীকার করা হয়। তাই এ মামলার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা ও কর্মীগণ এবং দলের যুব ও ছাত্র সংগঠন ব্যাপক জনসংযোগের আয়োজন করে ও এর বিরুদ্ধে সক্রিয় জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করে।

এখানে একটি প্রসঙ্গ অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে পাকিস্তানের কাছে বেদম মার খাবার পরে হিন্দুস্থান অকারণেই সহসা পূর্ব পাকিস্তানবাসী মুসলমান জনসাধারণের বড় আপনজন ও বন্ধু সেজে যায়। যুদ্ধের পর থেকেই হিন্দুস্থানের পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলিকাতাস্থ বেতার কেন্দ্র তথা আকাশবানী থেকে হরদম এমন সব অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছিল যার মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানবাসী মুসলমান জনগণের একমাত্র শত্রু হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানগণ এবং পূর্ব পাকিস্তানী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আসল ও একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু হচ্ছে হিন্দুস্থান তথা সেখানকার কট্টর

www.pathagar.com

ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দু জনগোষ্ঠী। আকাশবানী থেকে নিয়মিত "এপারবাংলা-ওপারবাংলা" নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ এবং ছাত্র ও যুব সমাজকে তাদের তথাকথিত শত্রু ও শোষক পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য জোরালো আহবান এবং আকুল আবেদন জানাতে থাকে। এ ছাড়াও, কলিকাতাসহ হিন্দুস্থানের বিভিন্ন আকাশবানী কেন্দ্র থেকে এমন সব কথা ও ধারাবিবরণী প্রচার করা হচ্ছিল যার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের সাথে পশ্চিম বাংলার তথা হিন্দুস্থানী হিন্দুদের কোন সমস্যা বা বিরোধ নেই; যত সমস্যা ও গোলমাল তা সবই পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানদের সাথে। এমন কি, পূর্ব পাকিস্তানকে গলা টিপে ভাতে ও পানিতে মারার জন্য হিন্দুস্থান যে মরণ-ফাঁদ "ফারাক্কা বাঁধ" তৈরী করতেছিল তাও পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এলেই পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার জন্য কোন সমস্যা থাকবে না-হিন্দুস্থান রাতারাতি এর সন্তোষজনক সমাধান করে দিবে। এ ভাবেই আকাশবানী পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ এবং বিশেষ করে তরুণ সমাজকে নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে ক্ষেপিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। তাই যখন আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা করে পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগের সাথে হিন্দুস্থানকেও প্রকাশ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফেলল তখন হিন্দুস্থানও সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ও নৈতিক নিয়ম-কানুন ভুলে গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়ে একে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এবার হিন্দুস্থান যেন আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসাবেই তার আকাশবানীর বিভিন্ন কেন্দ্র এবং বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী কলিকাতা বেতার কেন্দ্রকে পরিচালিত করতে থাকে। হিন্দুস্থান আওয়ামী লীগের চেয়েও অনেক বেশী সোচ্চার হয়ে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলাকে একটি সাজানো মিথ্যা কাহিনী হিসাবে বর্ণনা করে পাকিস্তানের দু'অংশের ভিতর বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে থাকে এবং এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণকে সোচ্চার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জোরালো আহবান জানাতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য আকাশবানী থেকে যখন এমন গভীর দরদ ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সুললিত বাণী প্রচার করা হচ্ছিল হরদম তখন কিন্তু হর-হামেশাই হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম নাগরিকদের উপর চলছিল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পৈশাচিক নির্যাতন ও অবিরাম দাঙ্গা। নিজের দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের রক্তে যে হিন্দুস্থান খেলছে নিয়মিত হোলি খেলা সেই বহুরূপী ব্রাহ্মণ্যবাদী চানক্য কূটনীতির অনুসারী দেশটিই আবার জান কোরবান করে দিচ্ছে তার প্রতিবেশী দেশটির মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ আর মুক্তির চিন্তায়। ধোঁকাবাজি আর কাকে বলে! বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সনের প্রারম্ভে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ও যুব সমাজের ভিতর ব্যাপকভাবে এমন একটি ধারনার সৃষ্টি হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানী শোষন থেকে মুক্তি পেতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে অবশ্যই অনেক বেশী মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবর রহমান প্রদত্ত ছয়দফা প্রস্তাবই হচ্ছে

www.pathagar.com

এর প্রকৃষ্ট কর্মসূচী। তরুণদের ভিতর অনেকটা এ বিশ্বাসও দানা বেঁধে উঠে যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের সোচ্চার ও প্রধান প্রবক্তা শেখ মজিবর রহমানকে অকারনেই মিথ্যা কাহিনী ফেঁদে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হয়েছে এবং এ মিথ্যা মামলায় তাঁকে সাজা দানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারনের স্বার্থ আদায়ের ন্যায্য সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাই আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্যের ধারাবাহিক বিবরনী সংবাদপ্রত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র ও যুব সমাজের অসন্তোষ ও বিরোধিতা দিন দিন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দেশে অরাজকতা ও হানাহানি উত্তরোত্তর উদ্বেগজনকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রান পাবার উদ্দেশ্যে সরকার ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারি করেও যখন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছিলেন না তখন ১৯৬৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের এক গোল টেবিল বৈঠকের আহবান করেন। ইতিমধ্যে, তথাকথিত গণ-আন্দোলনের ফলে ছাত্র-জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন এবং এ মামলার প্রধান আসামী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবর রহমানসহ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু এ বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী কার্যকলাপ ও প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। দেশকে একটি অনিবার্য গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা ও উপায় হিসাবে ১৯৬৯ সনের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ এক আবেগময় ভাষন প্রদানের মাধ্যমে প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। এভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমেই সবার অজ্ঞাতে এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান নামক মুসলিম-বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং গোটা দুনিয়ার পঞ্চম বৃহৎ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের আদর্শস্থানীয় অতি দ্রুত বিকাশমান একটি রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দ্বিধাবিভক্তির আয়োজনের পথে দ্রুত যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তানপন্থী অনেক লোকের মতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এ ভাবে সহসা ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। বরং এ কাজ না করে তিনি আরও একটু শক্ত ও নির্মম হলেই, বোধহয়, ভাল করতেন। তা হলে কিছু রক্তপাত ঘটাবার জন্য তাঁর কিছুটা দুর্নাম হলেও এতদঞ্চলে মুসলমানদের এত বড় সর্বনাশ হতো না পরবর্তীকালে। আসলে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পাকিস্তান ও পাকিস্তানী জনগণকে তাঁর নিজের চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসতেন বলেই দেশের মানুষের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর শাসন-ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চাননি।

www.pathagar.com

আট

ক্ষমতায় এসেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষনা করেন যে, অচিরেই পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সে নির্বাচন হবে অবশ্যই অবাধ ও নিরপেক্ষ। তিনি এও ঘোষনা করেন যে, যে দলই ভবিষ্যৎ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে তাদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিয়ে তিনি এবং সামরিক বাহিনী যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যারাকে ফিরে যাবেন। সামরিক শাসন জারির মাত্র এক সপ্তাহের ভিতর ৩০শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষনের মাধ্যমে ১৯৭০ সনের ৫ই ও ১০ই অক্টোবর যথাক্রমে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে দেন। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় সে জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর অস্থায়ী এবং অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় এমন সব দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করেন যাঁরা পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সরাসরিভাবে জড়িত ছিলেন না। নিরপেক্ষতার বিশেষ গ্যারান্টি হিসাবে তিনি তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার সদস্যরা আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলে ফরমান জারি করেন। এরপর তিনি পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে বৈঠক ও সলাপরামর্শ করেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এ সমস্ত পদক্ষেপ ও ক্রিয়াকলাপের ফলে সামরিক আইন জারির অল্পদিনের ভিতরেই পাকিস্তানের উভয় অংশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর হয়ে একটি আপাতঃ স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দেশের উভয় অংশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য ব্যাপক প্রচারনা ও জোর প্রস্তুতি চালাতে থাকে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ১৯৪৭ সনে আজাদী লাভের পর থেকেই আন্তর্জাতিক জোটভুক্তি ও ভাগাভাগির প্রশ্নে পাকিস্তান স্বাভাবিকভাবেই কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠী বিরোধী বিভিন্ন পাশ্চাত্য জোট ও শক্তি, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশেষ মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলে। গোড়া থেকেই পাকিস্তান "বাগদাদ চুক্তি" বা "সেন্টো প্যাকট" এবং "সিয়াটো প্যাক্ট" এর সক্রিয় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে, হিন্দুস্থান তার স্বভাবজাত বৈশিষ্টের কারনেই পাকিস্তান-বিরোধী বিভিন্ন শক্তি ও রাষ্ট্র এবং বিশেষ করে কট্টর ইসলাম-বিরোধী ও পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে অকারণেই শত্রুভাবাপন্ন কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সাথে বিশেষ মৈত্রীবন্ধন ও সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু চানক্য কূটনীতির অনুসারী হিন্দুস্থান কম্যুনিষ্ট রাশিয়া বা অন্য কোন

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জঘন্য দুশমন হিন্দুস্থান ও কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার গোপন স্বার্থ ও কর্মের ঐক্য গড়ে উঠে। তাই ১৯৬৫ সনে যখন হিন্দুস্থান রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে পাকিস্তান আক্রমন করে বসে তখন পাকিস্তানের তথাকথিত মিত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা শক্তিসমূহ যুদ্ধ বন্ধ করার পদক্ষেপের নামে পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত সমস্ত সামরিক সাহায্য সহসাই বন্ধ করে দেয়। আর অন্যদিকে, রাশিয়াসহ হিন্দুস্থানের মিত্ররা অব্যাহতভাবে এবং আরও অধিক মাত্রায় সামরিক সাহায্য দিতে থাকে হিন্দুস্থানকে। কিন্তু এতসবের পরেও যখন হিন্দুস্থান যুদ্ধে মার খাচ্ছিল পাকিস্তানের কাছে তখন এরা সবাই একজোট হয়ে পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করে এবং রাশিয়ার উজবেকিস্তানে নিয়ে তাসখন্দ চুক্তির নামে পাকিস্তানকে তার যুদ্ধে বিজিত এলাকা হিন্দুস্থানকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে।

পাকিস্তানের সাথে তার পাশ্চাত্য মিত্রদের বেঈমানীর আরও ভাল ও স্পষ্ট চিত্র এবং কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করা যায় ১৯৬২ সনের চীন-হিন্দুস্থান যুদ্ধের সময়কার অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে। মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধে যখন হিন্দুস্থানী সৈন্যরা চীনা লাল ফৌজের হাতে বেদম মার খেয়ে বেশ কয়েক হাজার বর্গমাইল সীমান্ত এলাকা ছেড়ে দিয়ে প্রাণ-ভয়ে পিছু হটে চলে আসে তখন ঘটনাচক্রে কম্যুনিষ্ট চীনের শত্রু এবং ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থানের সুহৃদ কম্যুনিষ্ট রাশিয়া তো অব্যাহতভাবে হিন্দুস্থানকে সমস্ত ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলই, অধিকন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সসহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য শক্তিসমূহও অনেকটা অযাচিতভাবেই হিন্দুস্থানকে বিপুল পরিমান সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করতে থাকে। অথচো, এ ব্যাপারে তাদের তথাকথিত মিত্র বিভিন্ন সামরিক জোটের সাথী ও সদস্য পাকিস্তানের জাতীয় অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্ন বা পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রবল আপত্তির কথা তারা মোটেই গ্রাহ্য করেনি। বিভিন্ন সামরিক জোট গঠন করার পেছনে পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিষ্ট শক্তিকে প্রতিহত করা। কিন্তু ওই সব সামরিক জোটে শরীক হবার পেছনে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল তার জঘন্য দুশমন ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থানের কবল ও ছোবল থেকে রেহাই পাওয়া এবং এ ব্যাপারে তার মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হওয়া। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ছাড়া লাল চীনের তরফ থেকে সরাসরি কোন হুমকি ছিল না পাকিস্তানের জন্য। বরং সেন্টো ও সিয়াটো সামরিক জোটের সদস্য হবার ফলেই পরবর্তীতে চীনসহ বাকী কম্যুনিষ্ট জগৎ পাকিস্তানকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে, প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ চীন-হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান-হিন্দুস্থান যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে, তার মিত্ররা কেউ তার স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রতি নজর দিল না বা প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এল না। এ অবস্থাটা পাকিস্তানী জাতি ও নেতৃবৃন্দকে তাদের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করার তাগিদ দেয়।

এ সমস্ত কারণে সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে তথাকথিত পশ্চিমা মিত্রদের

www.pathagar.com

সাথে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের ভুলবুঝাবুঝি শুরু হয়ে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান মুসলিম দুনিয়ার ভিতর থেকে তার নতুন ও সত্যিকার বন্ধু খুঁজতে শুরু করে। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটেই আফ্রো-ত্রশিয়ান সম্মেলনের চার বিশিষ্ট কর্ণধার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকার্নো, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের এবং আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহম্মদ বেন বেল্লা কায়রোতে এক সম্মেলনে একত্রিত হয়ে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ ব্যাপারে দিক্‌নির্দেশনার প্রয়াস পান। মুসলিম বিশ্বের এ চার বিশিষ্ট নেতার এ ক্ষুদে শীর্ষ সম্মেলন মুসলিম উম্মার কাছে সাদরে গৃহীত হলেও মুসলিম-বিরোধী বিশ্বে এর বিরুদ্ধে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মুসলিম-বিরোধী পাশ্চাত্য জগৎ এ ব্যাপারটিকে তাদের স্বার্থের প্রতি মারাত্মক হুমকির আলামত হিসাবে গন্য করে এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্যোগ নেয়ার আয়োজন করে। অল্পদিনের ভিতরেই ইন্দোনেশিয়ায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সুকার্নো ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তাঁকে গৃহবন্দী করা হয়। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লাকেও সামরিক অভ্যুত্থানের নামে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশান্তরিত করা হয়। অপর দিকে, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের সহসা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। এবার মুসলিম-বিরোধী খৃষ্টান পাশ্চাত্য জগতের জন্য বাকী রইল তাদের একমাত্র শত্রু দারুন চক্ষুশুল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক আইয়ুব খানের এটা বুঝতে বাকী রইল না। তাঁর এ উপলব্ধির ফসল ও পরোক্ষ ইঙ্গিত হিসাবেই তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত আত্ম-জীবনীমূলক রাজনৈতিক গ্রন্থ "প্রভু নয়, বন্ধু"। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না তাঁরও। বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। দেশীবিদেশী পাকিস্তানের জাতীয় দুশমনরা তখন মারাত্মকভাবে তৎপর। তারই অনিবার্য ফল হিসাবে ১৯৬৯ সনে ক্ষমতা হারাতে হলো তাঁকেও।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেন্টো ও সিয়াটো জোটভুক্ত পাকিস্তানের পশ্চিমা মিত্রদের আসল ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিজম ঠেকানো এবং এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা। তাই যখনই পাশ্চাত্য জগৎ মনে করতো যে, এবার আর কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তখনই তারা পাকিস্তানের স্বার্থের বিপরীত কোন কাজ বা পাকিস্তানের এক নম্বর দুশমন হিন্দুস্থানকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে দ্বিধাবোধ করতো না। কম্যুনিজম ঠেকানোর ব্যাপারে পাশ্চাত্য জগৎ মনে করতো যে, ১৯৬২ সনের চীন- হিন্দুস্থান যুদ্ধের পরে অন্তত হিন্দুস্থানকেও তাদের আসল উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে যদিও হিন্দুস্থান নিজের স্বার্থে পাশ্চাত্য গোষ্ঠীকে কাজে লাগানো ছাড়া এ ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিল না। তাই ১৯৬২ সনের চীন-হিন্দুস্থান যুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্য জগৎ পাকিস্তানকে নসিহত করতে থাকে যে, কাশ্মীরসহ সমস্ত

www.pathagar.com

বিরোধ হিন্দুস্থানের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করে দু'টি দেশের উচিত তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে এ কাজটি ছিল প্রায় অসম্ভব। বাঘে-মোষে যেমন বন্ধুত্ব চলে না, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান বন্ধুত্বও প্রায় তেমনি একই রকম অসম্ভব। কারণ, বন্ধুত্ব কোন দিনও একতরফা হয় না। পাকিস্তান চাইলেও হিন্দুস্থান কোন দিনও আন্তরিকভাবে তা চায়নি বা চাইবে বলেও মনে হয় না। কারণ, হিন্দুস্থান আজ অবধি পাকিস্তানকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি। হিন্দুস্থানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোটা উপমহাদেশ জুড়ে এবং সম্ভব হলে, আশেপাশের আরও কিছু কিছু ছোট ছোট রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি বিশাল মহাভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখেই হিন্দুস্থান তার সমস্ত নীতিমালা ও কার্যাবলী পরিচালনা করে চলেছে তা সে মুখে যত শান্তির বুলিই আওড়াক বা গায়ে যে অহিংসার নামাবলীই জড়াক না কেন।

পাশ্চাত্য মিত্রদের সাথে পাকিস্তানের ভুলবুঝাবুঝির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের ব্যাপারে পশ্চিমাদের এ অকারণ ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বীয়ানা। এ ছাড়া, একটি মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের উত্তরোত্তর বলিষ্ঠ পদচারনা ও উন্মেষ পাশ্চাত্য জগতের কাছে একেবারে অসহ্য তো ছিলই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের যখন এমনি টানা-পোড়েন চলছিল তখন পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান যুক্তরাষ্ট্রকে তার দেয়া সাহায্যের যে অংশ সে নিজে সরাসরি নগদ পাকিস্তানে ব্যয় করতো তার একটি খতিয়ান পাকিস্তান সরকারের কাছে পেশ করার নির্দেশ দেন। পাকিস্তানের এ মনোভাবের ফলে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় করা এ নগদ অর্থের অনেকখানিই ব্যয় করা হতো সেই সব দল ও গোষ্ঠীর পিছনে যারা যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে তাদের স্বার্থানুকূলে তাদের পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতো। আর দরকার হলে, এরা পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করতে বা হিন্দুস্থানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে যে কোন রকম সম্পর্ক গড়ে তুলতেও রাজী ছিল। তাই এ গোপন ও গর্হিত ভূমিকার খবর যুক্তরাষ্ট্র কি করে পাকিস্তানকে দেয়?

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬৫ সনে পাকিস্তান-হিন্দুস্থান যুদ্ধের সময় বৃহৎ শক্তির চাপের ফলেই পাকিস্তানকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হয়েছিল এবং পরবর্তীতে রাশিয়ায় গিয়ে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে বিজিত এলাকা হিন্দুস্থানকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে হয়েছিল। এ সময় পাকিস্তানের বৈদেশিক মন্ত্রী এবং শাসক দল 'মুসলিম লীগের' সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন তুখড় বক্তা ঝানু কূটনীতিক উদীয়মান সুচতুর রাজনৈতিক নেতা প্রখ্যাত আইনজ্ঞ জুলফিকার আলী ভুট্টো। তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই হঠাৎ করে কেন যেন তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হলেন এবং মন্ত্রিত্ব হারায়ে দেশময় এই বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তাসখন্দ চুক্তিতে এমন কিছু গোপন কথা আছে যা পাকিস্তানের

www.pathagar.com

স্বার্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং দরকার হলে, তিনি তা জনসমক্ষে ফাঁস করে দিবেন। ভুট্টো সাহেবের এ কাজটি ছিল কূটনৈতিক শিষ্টাচারের জঘন্য খেলাপ। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কার পাকিস্তানের দায়িত্বপূর্ণ বৈদেশিক মন্ত্রী থাকার পরেও জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর মুখে এ কথাগুলো ছিল নিতান্তই অশোভন ও অনভিপ্রেত। কিন্তু তবুও তিনি তা করলেন এবং ব্যাপারটি জনমনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

মন্ত্রিত্ব হারাবার পরে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গোটা পাকিস্তানের ব্যাপক এলাকা সফর করেন এবং ১৯৬৭ সনে "পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি" নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁর এ দলটিও ১৯৬৯ সনে আইয়ুব-বিরোধী তথাকথিত গণ-আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। পিপল্‌স পার্টি ঘোষণায় নাম ও আদর্শ উভয় দিক থেকেই গণচীনের ধাঁচে গঠিত হয় যদিও বাস্তবে তার সাথে সংগতি ছিল নিতান্তই নগন্য। তবে কম্যুনিজমের তথাকথিত সমাজবাদী আদর্শের মত পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির ঘোষিত এ তথাকথিত সমাজবাদী আদর্শও অল্পদিনের ভিতরেই অন্ততঃ পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে ধোঁকা দিতে সমর্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

নয়

১৯৬৯ সনের তথাকথিত গণ-আন্দোলনের ফলে শেখ মজিবর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেয়েই ব্যাপক গণ-সংযোগ শুরু করেন এবং গোটা পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়াতে থাকেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর, বন্দর এবং লোকালয় ঘুরে ঘুরে সভাসমিতির মাধ্যমে এই বলে প্রচার করতে থাকেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত অসুবিধা এবং দুঃখ-কষ্টের একমাত্র কারণ হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের নিষ্ঠুর শোষন আর এ শোষন থেকে মুক্তি পেতে হলে তাঁর ঘোষিত "ছয়দফা" কর্মসূচী বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। তিনি পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণকে এই বলে বুঝাতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সোনালী আঁশ পাট বিক্রি করে যে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তা পুরোপুরিই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর, বন্দর ও নিত্য নতুন নগর সৃষ্টি ও উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে অথচ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য তাকে তার ন্যায্য হিস্যা দেওয়া হচ্ছে না যার ফলে, পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মাঝে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন আরও বৃদ্ধিই পাচ্ছে। তাই এ ভাবে চলতে থাকলে অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সর্বনাশের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পরিত্রান দানের মাধ্যমে বাঙালী জাতিকে এক নতুন জগতে নিয়ে যেতে চান শেখ মুজিব। তাঁর স্বপ্নেদেখা সে নতুন জগতের নাম হচ্ছে "সোনার বাংলা।" তাঁর স্বপ্নের সে দেশে থাকবে না কোন অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট কিংবা কোন রকম ন্যুনতম অশান্তি। মুজিবের দেখা সে স্বপ্নের দেশ হবে পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে শাসিত এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও অব্যাহত উন্নতির এক আদর্শ রাষ্ট্র যা দুনিয়ার মানুষ আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু মুজিবের বিঘোষিত এ স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে দিতে হবে পাকিস্তানের "ফেডারেল রাষ্ট্রীয়" কাঠামোর ভিতর দুনিয়ার ইতিহাসে এক নজিরবিহীন স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা তথা তাঁর "ছয়দফার" পূর্ন ও হুবহু- বাস্তবায়ন।

শেখ মুজিব জনগণের কাছে এই বলে প্রচার করতে থাকেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করছে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রাই শুধু পশ্চিম পাকিস্তান বাবহার করছে না, বরং পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত বিভিন্ন পন্য সামগ্রীও নিজেরা পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের চেয়ে অনেক কম দামে ব্যবহার করছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, কাগজ পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত হয় অথচো পূর্ব পাকিস্তানে এর দাম দিস্তাপ্রতি আট আনা (পঞ্চাশ পয়সা) কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর দাম ছয় আনা (সাঁইত্রিশ পয়সা)। দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, চাউল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন

www.pathagar.com

হয় অথচো এর দাম পূর্ব পাকিস্তানে সেরপ্রতি বার আনা (পঁচাত্তর পয়সা) এবং মনপ্রতি ত্রিশ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে চাউলের দাম সেরপ্রতি দশ আনা (বাষট্টি পয়সা) এবং মনপ্রতি পঁচিশ টাকা। কারণ হিসাবে তিনি যা বললেন তা নিতান্ত হাস্যাস্পদই শুধু নয়, বরং চরম অজ্ঞতা ও আহাম্মকিরও পরিচায়ক। যেমন, কাগজের দাম পূর্ব পাকিস্তানে বেশী হওয়ার কারণ হিসাবে তিনি বল্লেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পমালিকগণ পূর্ব পাকিস্তানে কাগজ উৎপাদন করার পরে তাতে সীল মারার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় এবং ওখানে বসে কাগজে সীল মারার পরে আবার পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসে বাজারজাত করার জন্য। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে তাতে সীল মারার পরে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত এনে বাজারজাত করার জন্য যে পরিবহন ও অন্যান্য খরচ পড়ে তার কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত কাগজের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে দিস্তাপ্রতি দু'আনা বেশী। কি অদ্ভূত যুক্তি আর গাঁজাখোরী গল্প! যদিও মূর্খ গ্রাজুয়েট (Illiterate graduate) হিসাবে তখনকার দিনে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি দুর্নাম ছিল শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে তবুও অতি সহজে ধরা পড়ে যাবার মত একটি ডাহা মিথ্যাকথা তিনি কেন যে বলতে গেলেন তা ঠিক বোধগম্য নয়। কারণ, অতি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন একজন মানুষই এটা অতি সহজেই বুঝতে পারে যে, যদি শোষন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাগজের দাম বাড়িয়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বাজারজাত করতে হয় তা হলে সে জন্য সীল মারতে কাগজ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে হয় না, পূর্ব পাকিস্তানে বসেই সে সীল মারা যায় বা দাম বাড়িয়ে দেয়া যায়। আর এতে করেই শেখ সাহেবের কথিত শোষন করা যায় সত্যিকার অর্থে। কিন্তু কাগজ উৎপাদনের পরে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে সীল মেরে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনার যেমন কোন দরকার হয় না বা যুক্তি নেই তেমনিভাবে এমন আহাম্মকি গল্পের বৈষম্যমূলক শোষনে কোন বাড়তি লাভও থাকে না। শোষনের লাভ তো পরিবহন ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন খরচেই শেষ হয়ে যায়। তা হলে, শেখ সাহেবের এ ভূতুরে গল্পের আহাম্মকি তিনি বল্লেও কোন ব্যবসায়ীই তা করবেন না কোন দিনও। তবুও তিনি এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ এ কথা বলে চললেন এবং হুজুগে বাঙালী জাতি তা অবলীলাক্রমে বেদবাক্যের মতই বিশ্বাস করে ফেল্‌ল।

সত্যিকারভাবে, শেখ সাহেব পাকিস্তানের দু'অংশের মাঝে কাগজ ও চাউলসহ যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের যে বৈষম্যের কথা ও কারণ উল্লেখ করেছেন আসলে তা বাস্তবতার সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। বরং বাস্তব ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। যেমন, চাউল শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই উৎপন্ন হতো না। ১৯৪৭ সনের আজাদী লাভের বহু পূর্ব থেকেই পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমান চাউল উৎপন্ন হতো। যেহেতু, ভাত ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল না তাই ১৯৪৭ সনের পূর্বে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর উদ্বৃত্ত চাউল

www.pathagar.com

সরবরাহ করা হতো। এরপরে, আজাদী লাভের পরবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত চাউল নিয়মিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য ঘাটতি পূরনের জনা সরবরাহ করা হতো। এর ফলে, পশ্চিম পাকিস্তান বরং নিয়মিতভাবে তার উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের চাউল বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। এখন কথা হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চাউল পূর্ব পাকিস্তানে তো আর হাওয়ায় উড়ে আসতো না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বয়ে এনে সরবরাহ ও বন্টন করার জন্য অবশ্যই পরিবহনসহ আনুষঙ্গিক কিছু খরচ হতো যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চাউলের দাম সামান্য কিছুটা বেশী থাকা মোটেই কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। দুনিয়ার ইতিহাসে কোন যুগে কোন দেশে অদ্যাবধি এর কোন ব্যতিক্রম আছে বলে তো মনে হয় না। আজকে বাংলাদেশের মত অতি ক্ষুদ্র একটি দেশেও খাদ্যউদ্বৃত্ত উত্তরবঙ্গে চাউলের দাম আর খাদ্যঘাটতি দক্ষিণবঙ্গে বা এমন কি রাজধানী ঢাকায়ও কি চাউলের দাম এক এবং অভিন্ন অথবা দেশের খাদ্যউদ্বৃত্ত এবং খাদ্যঘাটতি অঞ্চলসমূহের ভিতর কি চাউলের দামের প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করছি না? দামের এ পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। এ পার্থক্য না থাকলে চাউল বা পন্য সরবরাহ হবে কেন?

যা হোক, আওয়ামী লীগ এবং শেখ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য যা যে ভাবে দরকার তা সেই ভাবেই বলে যেতে লাগলেন তাতে সত্য-মিথ্যা বা যুক্তি -অযুক্তির ধার ধারার পরোয়া করলেন না। এ ব্যাপারে তাদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান ছিল এক হাজার মাইল ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন। তাই "আগড়তলা ষড়যন্ত্র" মামলা থেকে রেহাই পাবার পরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যখন শেখ সাহেবকে তাদের আপনজন হিসাবে মনে করতে শুরু করে তখন শেখ সাহেব এবং আওয়ামী লীগও ঝোপ বুঝে কোপ মারতে শুরু করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যা খুশি তাই বলে যেতে থাকে। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের হাজার মাইল ব্যবধানে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা বা উপায় সাধারণ মানুষের এখতিয়ারের বাইরে ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, রেডিও পাকিস্তান ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানী জনগনের জন্য বিশেষভাবে প্রচারিত ও শ্রুত প্রধান বাংলা অনুষ্ঠান ছিল আকাশবানী তথা হিন্দুস্থান বেতারের কলিকাতাস্থ বাংলা অনুষ্ঠান। আগে আকাশবানীর কোন কথায় পূর্ব পাকিস্তানীরা বিশ্বাস না করলেও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ সাহেবসহ সকল অভিযুক্তদের ছেড়ে দেবার পরে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ক্রমে ক্রমে হিন্দুস্থানী কূট ও মিথ্যা প্রচারনাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে এবং পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ভিতর অবিশ্বাস ও তিক্ততা দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, উপমহাদেশের বাইরে বিশ্বের যে সমস্ত দেশ ও অঞ্চল থেকে বিশেষ বিশেষ বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল

www.pathagar.com

বিবিসি তথা ব্রিটিশ বেতার বিভাগ এবং ভয়েস অব আমেরিকা তথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানমালা। আগেই বলা হয়েছে যে, বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জগৎও হিন্দুস্থান ও রাশিয়ার মতই একান্তভাবে পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তাই ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য ও বিজাতীয় বেতারের বাংলা অনুষ্ঠান থেকেও অব্যাহতভাবে পাকিস্তানের দু' অংশের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য ও সমস্যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমনভাবে প্রচার করা হতো যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মনে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার ও জনগনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দিন দিন ফেনায়িত হতে থাকে।

চতুর্থতঃ, পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের শতকরা আশি ভাগই ছিল অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সূর্য এখানেই প্রথম অস্তমিত হয়েছিল। তাই স্বভাবতঃই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী অশিক্ষিত, অজ্ঞ, অস্বচ্ছল ও পশ্চাদপদ এখানকার মুসলিম জনসাধারণ প্রায় দু'শ বছরের বৃটিশ শাসন ও শোষনের দোসর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও বিজাতীয় প্রচারনার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হয়নি। ফলে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে শত্রুর অপপ্রচার ও কুমন্ত্রনাকেই তারা সত্যকথা ও হিতোপদেশ বলে গন্য করে বসে।

সে ব্যাপার যাই হোক, পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষিত নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, আওয়ামী লীগ ও শেখ মজিবর রহমান এবং তাঁদের সহায়তাদানকারী বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলিও তাদের পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারনার মাত্রাও ততই উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিতে থাকে।

এ ভাবে ধীরে ধীরে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মুসলিম লীগ, পিডিপি ও জামায়াত-ই-ইসলামী সমেত পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান-বিরোধী সমস্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিযুক্ত ও সত্যকথা বললেও পূর্ব পাকিস্তানী জনগনের একটি বিরাট অংশ তা আর একেবারেই বিশ্বাস করতে রাজী ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, তাদের বিশ্বাস করার কোন কারনও ছিল না। কারন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নেতৃত্বে শাসক দল কনভেনশন মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যান্য এ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি তো এতদিন আওয়ামী লীগের সাথেই একত্রে সরকার-বিরোধী আন্দোলন করেছিল এবং একই সুরে ও একই ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছিল। তাই এবার সহসা আর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতে বা বিশ্বাস করতে তারা সহজে রাজী ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারন মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণভাবে স্বায়ত্তশাসন বা ছয়দফা বুঝতো না বা জানতোও না এবং তার প্রয়োজনও বোধ করতো না। তারা শুধু বুঝতো এবং মনে করতো যে, আকাশবানী, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, আওয়ামী লীগ এবং শেখ সাহেব যখন বলছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী শোষনই তাদের সকল দুঃখ-কষ্টের একমাত্র কারণ তখন আওয়ামী লীগ তথা শেখ সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানে অন্ততঃ

www.pathagar.com

আবার একবার পূর্ব পাকিস্তানী শাসনের মাধ্যমে তাদের বড় সাধের "সোনার বাংলা" ভোগ করে দেখতেই হবে। তা না হলে যে তাদের মানবজনমই বৃথা!

আওয়ামী লীগের পক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনেকটা অসহিষ্ণু ও বেপরোয়া হয়ে উঠেন। তারা এতদিনের তথাকথিত গণ-আন্দোলনের সাথী এবং সহযোগী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সভাসমিতি গায়ের জোরে লাঠির ঘায়ে বন্ধ করে দিতে শুরু করেন। এ ভাবেই তারা জামায়াত-ই ইসলামীসহ পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু নেতার রক্তে রঞ্জিত করে দেয় অনেক সভাস্থল। সারা দেশে একটা অগণতান্ত্রিক অসহিষ্ণু অস্বস্থিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মনে হচ্ছিল, দেশটা যেন কোন এক অজানা সর্বনাশের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে।

ক্ষমতায় এসেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করেছিলেন যথাক্রমে ১৯৭০ সনের ৫ই ও ১০ই অক্টোবর। কিন্তু ইতিমধ্যে আগষ্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানে এক ভয়াবহ বন্যা হয়। এর ফলে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে যথাক্রমে ডিসেম্বর মাসের ৭ ও ১৭ তারিখ পুনঃ নির্ধারন করা হয়। কিন্তু বিধি বাম। পাকিস্তানের জন্য আরেকটি কঠিন আঘাত এলো ১৯৭০ সনের ১২ই নভেম্বর। এই দিনটিতে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকায় বয়ে যায় এক সর্বনাশা ঘুর্নিঝড়। ঝড়ের তান্ডবলীলায় পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপসমূহে মারা যায় অগনিত লোকজন এবং অসংখ্য গৃহপালিত পশুপাখী। ধারণা করা হয়, দেশের ইতিহাসে নজীরবিহীন এ ঝড়ে সর্বমোট প্রায় দশ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এ ছাড়া, ওই সময় উঠতি ফসল, ধনসম্পদ ও ঘর-বাড়ীরও ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্দ গোটা অঞ্চলে আর্তমানবতার করুন হাহাকারে ভারী হয়ে উঠে আকাশবাতাস। কিন্তু দুর্ভাগ্য পাকিস্তানী জাতির। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস শেষ হয়ে যাবার পরে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক দপ্তর থেকে ঝড়ের ফলে সংগঠিত ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাৎক্ষনিকভাবে তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান সামান্য বলেই উল্লেখ করা হয়। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের সাথে দেশের অবশিষ্ট এলাকার টেলিগ্রাম, টেলিফোন এবং অন্যান্য সমস্ত যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই ঝড়ের দু'একদিন পরে এবং প্রায় সপ্তাহখানেকের ভিতর দেখা গেল যে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ভয়াবহ এবং অকল্পনীয়। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য ত্রান ও সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ বা তদুদ্দেশ্যে যথাযথ ত্বড়িৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের দানবীয় তান্ডবলীলার খবর পৌঁছার সাথে সাথে যথাশীঘ্রসম্ভব হেলিকপ্টার ও যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে ব্যাপক ত্রান ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এর পরেও, পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তান-বিরোধী নেতৃবৃন্দ অকারণেই উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং এই বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করতে থাকে যে, ইচ্ছে করেই কেন্দ্রীয় সরকার অনেক বিলম্বে এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপ তথা কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম জনক ইসলাম-বিরোধী প্রায় গোটা পথভ্রষ্ট শ্রেনীর অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক বহু রাজনৈতিক অঘটনের নায়ক সনদবিহীন মাওলানা মরহুম আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর আঙ্গুল উঁচিয়ে বললেন, "ওরা কেউ আসেনি", তাই এর পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানীদের আর কোন সম্পর্ক নেই।

ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে মুসলিম-বিশ্ব ও পাশ্চাত্য জগৎ এবং বিশেষ করে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমান ত্রানসামগ্রী প্রেরন করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা সরাসরি জনগনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিছুটা পরিমান সাহায্য আসে প্রতিবেশী হিন্দুস্থান থেকেও। এ সমস্ত ত্রানসামগ্রী সাধারণভাবে হিন্দুস্থান নিজস্ব উদ্যোগে এবং আওয়ামী লীগের মাধ্যমে উপদ্রুত এলাকায় জনগনের ভিতর বিতরণ করে। পাকিস্তান-পন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দুর্গত জনগনের সাহায্যে যথাসম্ভব অর্থ ও পন্যসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসে।

দুর্গত জনগনের মধ্যে ত্রানসামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বাসন কার্য পরিচালনার মাঝে আওয়ামী লীগ এবং হিন্দুস্থানসহ আন্তর্জাতিক পাকিস্তান-বিরোধী গোষ্ঠী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তথা পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে ব্যাপক কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার চালাতে থাকে এবং দুর্গত মানুষের মন বিষিয়ে তোলতে থাকে। মানবতার সাহায্যের নামে এরা পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলন গড়ে তুলে। এদের বিরুদ্ধে এও অভিযোগ ছিল যে, ত্রানসামগ্রী বিতরণ করার ফাঁকে এরা আওয়ামী লীগসহ পাকিস্তান বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল যা পরবর্তীকালে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

বন্যা এবং ঝড়ে উদ্ভূত এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে আরও সুষ্ঠুভাবে ত্রান ও পুনর্বাসন কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ, পিডিপি ও জামায়াত-ই-ইসলামীসহ পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আসন্ন নির্বাচনের তারিখ আরেকবার পিছিয়ে দেবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু কোন আবেদন- নিবেদনেই ইয়াহিয়া খানের মন গললো না। তাঁর ভাবখানা ছিল যেন, পাকিস্তান থাকুক আর নাই থাকুক আসন্ন নির্বাচন নির্দিষ্ট তারিখে হতেই হবে; এ ব্যাপারে কোন কথাই তিনি শুনতে রাজী নন। এ যেন, রোম পুড়ছে আর নিরো বাঁশি বাজাচ্ছেন।

যথাসময়ে পূর্বঘোষিত তারিখ ও সময়সূচী অনুসারেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। শুধুমাত্র ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি আসনের কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

ও প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারী পিছিয়ে দেয়া হল। ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে বয়ে যায় এক অকল্পনীয় সর্বনাশা ঘুর্নিঝড় যার ভয়াবহ তান্ডবলীলার অশুভ ছোবলে নানা ঘটনার ঐতিহাসিক বিবর্তনে এক সময়ে ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল মুসলিম বিশ্বের আশাভরসা এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের আজাদীর প্রতীক পাকিস্তান। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, পাকিস্তানের দু'অঞ্চলে দু'টি প্রধান আঞ্চলিক দল সেখানকার প্রায় সব ক'টি আসন জয় করে নিয়েছে। এ ভাবেই, চূড়ান্ত নির্বাচন শেষে জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ জয় লাভ করেন। প্রায় প্রতিটি আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে ধরাশায়ী করেন। তবে মোমেনশাহীর একটি আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রধান জনাব নূরুল আমীন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচনী এলাকা থেকে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। অন্য দিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বমোট ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৫৭টি বাদে অন্য সব ক'টিতে পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি মনোনীত প্রার্থীগন জয়লাভ করেন। যদিও পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সর্বমোট তিনশত আসনের মধ্যে পাকিস্তানের ইতিহাসে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে মোট ১৬০টি আসন লাভ করে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কিন্তু তবুও তারা পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও না পাওয়ার ফলে সার্বিক বিচারে রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানে তারা তাদের একটি জাতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়। ঠিক একইভাবে, পিপল্‌স পার্টিও পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ আসনের অধিকাংশ লাভ করলেও তারা পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনেও জয়ী হতে না পারার ফলে এ দলটিও নিজেদের একটি জাতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়নি।

১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র কয়েকটি আসন বাদে বাকী সবগুলিতে জয়লাভ করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তারা একটি আসনও লাভে সমর্থ হয়নি। ঠিক এমনিভাবেই, পিপল্‌স পার্টিও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও এ দলটি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে একটি আসনও কব্জা করতে পারেনি। নির্বাচনে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলে দু'টি আঞ্চলিক দলের এহেন আঞ্চলিক চরিত্র ও ফলাফল লাভের ফলে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয় যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসাবেই একদিন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, নির্বাচনে মুসলিম লীগসহ

www.pathagar.com

পাকিস্তানপন্থী দলসমূহের এ শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এ দলগুলি সবই আওয়ামী লীগ-বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনে এ দলগুলি কোন সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয় যার ফলে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী আসনে প্রধানতঃ একজন পাকিস্তান-বিরোধী প্রার্থী তথা আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা চার থেকে ছয়জন পাকিস্তানপন্থী প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইসলাম ও পাকিস্তানপন্থীদের ভোটের এত ভাগাভাগির মাঝে স্বভাবতঃই অতি সহজে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগন নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। এতসবের পরেও, ঢাকাসহ দেশের বেশ কয়েকটি নির্বাচনী এলাকাতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ পাকিস্তানপন্থী দলসমূহের বেশ কিছু প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সামান্য ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনী বৈতরনী পার হয়ে আসেন। তাই এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না যে, যদি পাকিস্তানপন্থী দলসমূহ এ নির্বাচনে একজোট হয়ে তাদের সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকাতে একক প্রার্থী দাঁড় করাতে পারতো তা হলে ১৯৭০ সনের এ নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ আলাদা হতো এবং তা হলে পাকিস্তানকে নির্বাচন পরবর্তীকালে এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো না।

১৯৭০ সনের নির্বাচনে একটি বিশেষ লক্ষ্যনীয় ব্যাপার ছিল, এতদিন এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে পছন্দ করতো না এবং পূর্ববর্তী বিভিন্ন নির্বাচনে তারা সাধারণতঃ ন্যাপসহ বিভিন্ন ইসলাম-বিরোধী দলকেই তাদের ভোট দিয়ে আসছিল। কিন্তু এবার পূর্ব পাকিস্তানের মোট ভোটের শতকরা প্রায় বিশভাগ হিন্দু ও অমুসলিম ভোটার একচেটিয়াভাবে দেশের সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় অন্য কোন দল নয়, একমাত্র আওয়ামী লীগ প্রার্থীদেরকেই তাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করে। নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কমবেশী এই বিশভাগ "রিজার্ভ ভোটই" ছিল ১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগের এমন অকল্পনীয় এবং অভূতপূর্ব বিজয়ের মূল গোপন রহস্য ও আসল শক্তি। অদ্যাবধি আওয়ামী লীগ দেশের বিভিন্ন নির্বাচনে অমুসলমান "রিজার্ভ" ভোটের এ বিশেষ সুবিধাটি ভোগ করে আসছে প্রায় একচেটিয়াভাবে।

১৯৭০ সনের নির্বাচনের আরেকটি বৈশিষ্ট ছিল, পাকিস্তানের ইতিহাসে এবারই প্রথম আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ব্যাপক "জালভোট" ও "ভোট-কারচুপির" নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হয়। এ ছাড়া আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, ১৯৭০ সনের এ নির্বাচনে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত টাকার ফলে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকাতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ যেখানে প্রচুর ও যথেচ্ছ টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছিল সেখানে পাকিস্তানপন্থী দলসমূহ তেমন কোন তহবিলের ব্যবস্থা করতে পারেনি।

www.pathagar.com

দশ

১৯৭০ সনের নির্বাচনে অংশগ্রহনের পূর্বশর্ত হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের জন্য অবশ্যপালনীয় কতিপয় মৌলিক নীতিমালা ঘোষণা করেন। এ সমস্ত মৌলিক নীতিমালাসম্বলিত সামরিক ফরমানটির নাম দেয়া হয় "লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার"- সংক্ষেপে এল এফ ও, বাংলা তরজমায় একে বলা হতো "আইনগত অবকাঠামো আদেশ।" নির্বাচনে অংশগ্রহনের পূর্বে যথাসময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বাধ্যতামূলকভাবে এই "আইনগত অবকাঠামো আদেশ" এর শর্তাবলী শর্তহীনভাবে মেনে চলার অঙ্গীকারনামায় সই করে। আওয়ামী লীগ ও পিপল্‌স পার্টিসহ নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী কোন রাজনৈতিক দলের বেলায়ই এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না।

আইনগত অবকাঠামো আদেশের মূল কথাগুলি ছিল নিম্নরূপ।

১। নির্বাচনের পরে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের দ্বারা প্রণীতব্য পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হবে ইসলাম।

২। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাসম্বলিত পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সরকার হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির।

৩। সংখ্যালঘুদের পূর্ণ ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিকভাবে হবে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র।

আইনগত অবকাঠামো আদেশের এ সমস্ত ধারাসমূহ প্রকৃতপক্ষে ছিল আওয়ামী লীগের তথাকথিত "ছয়দফার" সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তবুও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জেনেশুনেই এ সমস্ত ধারাসমূহ শর্তহীনভাবে মেনে চলার অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করেছিল এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ নীতিমালার বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্তও করেনি। কিন্তু নির্বাচনে অচিন্তনীয় সাফল্য লাভের পরে আওয়ামী লীগের কথাবার্তা এবং হালচাল সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে আওয়ামী লীগ তাদের এ বিজয়কে তাদের ঘোষিত তথাকথিত ছয়দফার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের দ্ব্যর্থহীন রায় বলে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে বেড়াতে থাকে। আওয়ামী লীগ এবার অনেকটা বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং ঘোষণা করে যে, বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য শুধু স্বায়ত্তশাসনে কাজ হবে না, এ জন্য চাই স্বাধিকার।

শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের কণ্ঠে এমন সব কথাবার্তা শুনার পরে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কিছুটা প্রমাদ গুনেন। তিনি তড়িঘড়ি ঢাকা চলে

www.pathagar.com

আসেন। ঢাকা এসে জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে কথা বলেন এবং তাঁকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ীই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সদ্যনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঘোষনা করেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও যাবেন না। কারণ, তিনি মনে করেন, সেখানে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাঁকে খুন করে ফেলবে। বিপদে পড়লেন ইয়াহিয়া খান। অবশেষে, তিনি বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় রাজধানী ঢাকাতেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ।

এবার বাঁধল আবার নতুন ঝামেলা। পিপল্‌স পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো গর্জে উঠলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। তিনি বললেন, শেখ মুজিবের খামখেয়ালীপনা তিনি বরদাস্ত করবেন না। অধিবেশন রাওয়ালপিন্ডির পরিবর্তে ঢাকায় হলে তিনি নিজেও তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকায় যাবেন না বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন জাতীয় পরিষদ সদস্যকেও ঢাকা যেতে দেবেন না এবং এমনটি হলে তিনি গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে সহিংস বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেবেন। বড় বেকায়দায় পড়লেন জেনারেল ইয়াহিয়া। গত্যন্তর না দেখে ১লা মার্চ এক ভাষনের মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়া ৩রা মার্চ ঢাকায় আহুত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষনা করেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সাথে সাথে শেখ মুজিব হুঙ্কার ছেড়ে বলে উঠলেন, পশ্চিমাদের সাথে আর কোন আপোসের প্রশ্ন নেই; তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য এবার একদফার আন্দোলন শুরু করবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ৭ই মার্চ ঢাকার "রমনা রেসকোর্স মাঠে" এক জনসভা ডাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ তখন "সোনার বাংলা" ভোগের জন্য শেখ মুজিবের দিকে চেয়ে আছে। শেখ মুজিবের নামে তখন তারা পাগল। ৭ই মার্চ নির্ধারিত সময়ে রমনা মাঠে এক বিশাল জনসভায় আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিদের সম্মুখে শেখ মুজিব এক জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।" বাঙালী জাতির এ মুক্তির সংগ্রামে তিনি সবাইকে যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তিনি সরকারী কর্মচারীদের এবং কল-কারখানার শ্রমিকদের অফিসে বা কাজে না গিয়ে শুধু মাস শেষে বেতন নিয়ে আসার এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখন থেকে আর কোন অর্থ পাঠানো বন্ধ করে দেয়ার আদেশ দান করেন।

শেখ মুজিবের এ ভাষনের পরে কার্যতঃ পূর্ব পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। বস্তুতঃপক্ষে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

দেশ এক অরাজক-বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিপতিত হয়। গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে তখন সাজ সাজ রব। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল এবং ঢাকার কলেজসমূহের ছাত্রাবাসগুলোতে প্রকাশ্যে ভবিষ্যৎ ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র কুচকাওয়াজ ও মহড়া চলতে থাকে। এ ছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিশেষতঃ রাজধানী ঢাকাতে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও জঙ্গী শাখাগুলি দিবারাত্র মহড়া প্রদানের ব্যবস্থা করে। এ ভাবে দেশ একটি অনিবার্য সংঘাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। এ সময়ে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত রেডিও পাকিস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের নির্দেশমত বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো আবেদন সৃষ্টিকারী নানান ধরনের গান ও অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হতে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে কারো মনে হওয়ার কোন কারণ ছিল না যে, পূর্ব পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিকভাবে তখনও পাকিস্তানের একটি আইনানুগ অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী অবাঙালী জনসাধারণের উপর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপসহ পাকিস্তান-বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের সশস্ত্র গুণ্ডা ও পেটোয়া বাহিনীর বেপরোয়া লুটপাট ও অত্যাচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবার এ অত্যাচার ও লুটপাটের মাত্রা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী বা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোন অবাঙালী তথা মোহাজের বিমানযোগে পালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে না পারে তার জন্য ছাত্রনেতা আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে ঢাকা বিমানবন্দরগামী বিভিন্ন বাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তথাকথিত "চেকপোষ্ট" বসানোর নামে পশ্চিম পাকিস্তান গমনেচ্ছু যাত্রীদের সোনাদানা ও টাকা-পয়সা লুটপাটের ব্যবস্থা করা হয়। পথে-ঘাটে হরদম অবাঙালীদের মারধোর ও তাদের গাড়ী-বাড়ী পোড়ানো চলতে থাকে অবাধে। এ ছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বিভিন্ন সেনাছাউনিতে বসবাসরত জোয়ান ও অফিসারদের পানীয় পানির জন্য সংযোজিত সরবরাহ লাইন এবং বাইরে থেকে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। "তোমাদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো"-শেখ মুজিবের এ দম্ভোক্তি এ ভাবেই কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবেই শুরু হল শেখ মুজিবের ভাষায় বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়।

এখানে একটি কথা বলা হয়নি। নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত কতিপয় তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের পর পরই দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করে এই বলে প্রচার করে বেড়াতে থাকেন যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালী জাতির মুক্তির জন্য এখন আর ছয়দফা দিয়ে কাজ হবে না। জাতির সামনে, তাদের ভাষায়, একটি মাত্র দফা আছে, আর তা হলো সরাসরি স্বাধীনতা। জনগনের সাথে সম্পর্কহীন এ সমস্ত নেতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন

www.pathagar.com

আতাউর রহমান খান, শাহ্ আজিজুর রহমান এবং জনাব অলি আহাদ। এ দেশের কোন নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি অংশগ্রহনে যিনি কখনও আগ্রহী ছিলেন না, সেই মাওলানা ভাসানী আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে এ নতুন রাষ্ট্রটির নাম রাখেন "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান।"

এমনিতর একটি পরিস্থিতির মধ্যে প্রধানতঃ শেখ মুজিব ও তাঁর দলের নেতৃবৃন্দের সাথে রাজনৈতিক ফয়সালার শেষ চেষ্টা হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ঢাকা চলে আসেন। দিবারাত্র চলতে থাকে তাদের মাঝে বৈঠকের পর বৈঠক। কিন্তু ফলাফল বা অগ্রগতি হয় সামান্যই। শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ নেতারা অনড়, তথাকথিত ছয়দফার ব্যাপারে কোন কথা বলা যাবে না; ছয়দফার বাস্তবায়নে কোন আপোষ হবে না। অন্যদিকে, জেনারেল ইয়াহিয়া, মিঃ ভুট্টো, ওয়ালী খান ও নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের কথা হলো, পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা শেখ মুজিব নিশ্চিতভাবেই পাবেন কিন্তু পাকিস্তান একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যে আপোস ও সংশোধন করা দরকার, শেখ মুজিবকে তাঁর ছয়দফার ব্যাপারে তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ একেবারেই আপোষহীন অনড়। এ ব্যাপারে কোন ছাড় দিতেই তাঁরা নারাজ।

দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা যখন এমনি এক অচলাবস্থার মধ্যে চলছিল তখন ঢাকার পূর্বানী হোটেলের সামনে এক সমাবেশে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কতিপয় নেতার আহবানে অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন একটি নতুন দেশের স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে একটি নতুন পতাকা উত্তোলন করেন। সাদা ও সবুজের উপর চাঁদ-তারা খচিত ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারার প্রতীক পাকিস্তানী নিশানের স্থলে সবুজের বুকে লাল সূর্য ও পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার ছবি আঁকা ইসলামী ঐতিহ্য বিবর্জিত বিজাতীয় আদর্শ সম্বলিত তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসাবে উত্তোলিত এ নতুন পতাকাটি মাত্র কয়েক দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনের সামনে এক ছাত্রসমাবেশে শ্রী শিবনারায়ণ নামে এক হিন্দু যুবক প্রথম জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন। সত্যিকারভাবে, কে বা কারা এ পতাকাটির আসল উদ্ভাবক ও রূপকার সে বিতর্কের ফয়সালা আজও হয়নি। সে যা হোক, ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসের দিনে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার বদলে ঘরে ঘরে, দোকানপাটে এবং অফিস-আদালতে শেখ মুজিব কর্তৃক উড়ানো এই নতুন জাতীয় পতাকাটিই শোভা পেতে থাকে; সাধারণভাবে কোথাও কোন পাকিস্তানী জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়নি বা কাউকে উড়াতে দেয়া হয়নি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল, ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসের এ বিশেষ দিনে হিন্দুস্থানসহ ঢাকাতে অবস্থিত চারটি বিদেশী কূটনৈতিক

www.pathagar.com

মিশনও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের প্রতি চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের আঞ্চলিক অফিস ভবনশীর্ষে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার বদলে এই নতুন বাংলাদেশী পতাকাটিই উড়িয়ে দেয়।

২৩শে মার্চের পরে সত্যিকারভাবে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা বা আপোষের আর কিছু বাকী ছিল না। তবুও ২৪শে ও ২৫শে মার্চও শেখ মুজিব ও তাঁর দলের সাথে জেনারেল ইয়াহিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের নিষ্ফল কিছু কথাবার্তা হয়। দেশবাসী সাধারন মানুষ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আশার আর কোন আলোই দেখতে পাচ্ছিলেন না। সবার মনেই সন্দেহ, কখন কি জানি হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে, দেশের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানী জোয়ান ও অফিসারদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী সৈন্য ও অফিসারগণ বিদ্রোহ ও অভিযান শুরু করে দিয়েছেন। চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মেজর জিয়াউর রহমানসহ কিছু বাঙালী সৈন্য ও অফিসার বেতারযন্ত্র মারফত স্বাধীনতার ঘোষণা জানিয়ে অন্যান্য সকল বাঙালী সৈন্য ও অফিসারদের তাদের সাথে সামিল হবার আবেদন জানাতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনী এবং বাঙালী ইপিআর জোয়ানরা তো অনেক আগে থেকেই প্রকাশ্যে বাংলাদেশের পক্ষে শেখ মুজিবের নির্দেশ মাফিক কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

এমনি ঘটনাপ্রবাহের মাঝে ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ চলে যান। অপর দিকে, শেখ মুজিবের নির্দেশে আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতাই ইতিমধ্যে ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন সীমান্তের দিকে হিন্দুস্থানে পাড়ি জমাবার জন্য।

এহেন অবস্থাতে যা হবার তাই হল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে চলে যাবার পরেই শুরু হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান। ২৬শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে ঢাকা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার রাজারবাগস্থ পুলিশ লাইনে আঘাত হানে এবং সামান্য প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারটি দখল করে নেয়। এ ছাড়াও, ঐ রাতেই ঢাকার আজিমপুরস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর হেড কোয়ার্টারসহ আরও কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে হামলা চালিয়ে সেগুলিও অনায়াসেই কব্জা করে নেয়। আর এমনি ঘটনা প্রবাহের মাঝেই শুরু হল উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি আর খুনাখুনির এক অনভিপ্রেত হৃদয়বিদারক নাটকের এক সকরুন অধ্যায়। এতদিনে সার্থক হলো মুসলিম-বিদ্বেষী আন্তর্জাতিক বিজাতীয় চরদের বহুদিনের সাধনা, পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলনের সফল ও কার্যকর পদযাত্রা।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন দখল করার সময়ে দু'পক্ষের গোলাগুলিতে উভয় পক্ষেই কিছু লোক নিহত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পরের দিন এ দেশের খবরের কাগজ বা রেডিও-টেলিভিশনে এ সম্পর্কে তেমন কোন সাংঘাতিক কথা বলা না হলেও আকাশবানী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাসহ

www.pathagar.com

কতিপয় বিশেষ বিশেষ বিদেশী সংবাদমাধ্যম থেকে ঢাকায় পরিচালিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হামলার ফলে অসংখ্য মানুষের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা প্রচারিত হতে থাকে বার বার এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যার যা আছে তাই নিয়ে দেশের জন্য তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই এ সমস্ত প্রচারমাধ্যমগুলিকে তাদের শুভাকাঙ্খী ও বিশ্বস্ত বলে মনে করতে শুরু করেছিল। তাই এ সমস্ত বিদেশী সংবাদমাধ্যমগুলির উদ্দেশ্যপ্রনোদিত অতিরঞ্জিত এবং বহু ক্ষেত্রেই স্রেফ কাল্পনিক ও মিথ্যা অপপ্রচারের ফলে গোটা জাতি বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের অভিযানের প্রথম পর্বেই ২৬শে মার্চ মাঝরাতে শেখ মজিবর রহমানকে তাঁর নিজস্ব বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এ সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন তখনকার দিনে তাঁর খুবই বিশ্বস্ত কর্মী তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিষ্টার ডঃ কামাল হোসেন। আওয়ামী লীগ নেতারা বলে থাকেন যে, শেখ মুজিব নাকি ২৫শে মার্চই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের দেশ ত্যাগ করে হিন্দুস্থান চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাটি তারা আজও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে বলেননি বা আমাদেরও বোধগম্য নয় যে, স্বাধীনতার ডাক দিয়ে শেখ মুজিব তাঁর দলের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দিলেন অথচো ডঃ কামাল হোসেনকে নিয়ে তিনি নিজে তাঁর বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকলেন- তাঁর কাজের এহেন মারাত্মক স্ববিরোধিতার কারন কি? শেখ মুজিব কি এতই আহাম্মক ছিলেন, নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বদলে তাঁর মনে অন্য কিছু ছিল? নাকি, শেখ মুজিব পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের সাথে তলে তলে অন্য কোন খেলাই খেলতেছিলেন? ব্যাপারটি সত্যিই বড় রহস্যজনক। কবে এ রহস্যের জট খুলবে কে জানে!

২৬শে মার্চ সকালে হিন্দুস্থান বেতার তথা আকাশবানী থেকে প্রচার করা হলো, শেখ মুজিব পালিয়ে ঢাকা থেকে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন এবং স্বয়ং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহন করেছেন। এর কিছু পরে তথাকথিত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী তরুণ বাঙালী অফিসার মেজর জিয়ার কণ্ঠেও ওই একই কথা প্রচার করা হলো। অতঃপর, রেডিও পাকিস্তান থেকে খবর জানানো হলো যে, শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যথাসময়ে তাদের হেফাজতে নিয়ে নিয়েছে এবং শেখ মুজিবকে তাঁর পাকিস্তান-বিরোধী অপকর্মের জন্য বিচারের মাধ্যমে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ কিন্তু প্রাথমিকভাবে রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক প্রচারিত সত্য খবর ও হক কথাটি বিশ্বাস না করে অন্যান্য অনেক কিছুর মতই আকাশবানী এবং তথাকথিত স্বাধীন বাংলা বেতারের নির্ভেজাল মিথ্যা খবরটিই একেবারে খাঁটি সত্য হিসাবে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে নিয়েছিল।

www.pathagar.com

ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্র বা শক্তির সাথেই প্রকাশ্য কোন সামরিক জোট বা চুক্তির সদস্য হয়নি। এর ফলে, একদিকে পাকিস্তান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসহ হাতেগোনা মাত্র গুটি কতক রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়। আর অন্যদিকে, হিন্দুস্থান তার চিরাচরিত স্বভাবগত কারণে যেহেতু কোন রাষ্ট্রের সাথেই প্রকাশ্য কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি সেহেতু তার মিত্র কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ছাড়াও পাকিস্তানের তথাকথিত জোটভুক্ত বিভিন্ন পাশ্চাত্য বন্ধু রাষ্ট্রসমূহেরও সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়। এ ছাড়াও, হিন্দুস্থান বিশ্বের তথাকথিত তৃতীয় ধারা বা শক্তি তথাকথিত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সমিতি তথা "জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর" সদস্যপদ গ্রহন করে আন্তর্জাতিকভাবে পাকিস্তানকে একঘরে ও কোনঠাসা করে ফেলে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নানারকম অপবাদ ও দুর্ণাম রটনা করতে থাকে। এখানে একটি মজার ব্যাপার হলো এই যে, তথাকথিত এই জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য অনেক রাষ্ট্রই কম্যুনিষ্ট রাশিয়াসহ দুনিয়ার বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নিয়া গঠিত বিভিন্ন সামরিক বা মৈত্রীজোটের সদস্য থাকলেও তথাকথিত এ জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমিতির সদস্য হিসাবে কোন পাশ্চাত্য জোটভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রকেই স্থান দেয়া হতো না। কি অদ্ভূত জোটনিরপেক্ষতা! আর কি অদ্ভূত জোটনিরপেক্ষ জোট!

যা হোক, পাকিস্তান সেন্টো ও সিয়াটোসহ বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট-বিরোধী জোটের সদস্য হবার ফলে এতদঞ্চলে রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীন ঠেকাও আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পাশ্চাত্য ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত হতে থাকে। এর ফলে, মাঝে-মধ্যে যখনই দুনিয়াতে কম্যুনিষ্ট দেশ ও শক্তিসমূহের তরফ থেকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ও শক্তিসমূহ কোন সমূহ বিপদ বা হামলার সম্ভাবনা আঁচ করতো তখনই পাকিস্তানের প্রতি তাদের দরদ ও বন্ধুত্বের আতিশয্য প্রদর্শন করতে কসুর করতো না। এমন অবস্থাতে তারা পাকিস্তানকে অযাচিতভাবেও অনেক সাহায্য দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। অবশ্যি এমনও দেখা গিয়েছে যে, সহসা যখনই তারা তাদের কম্যুনিষ্ট শত্রুদের পক্ষ থেকে আবার বিপদের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করেছে তখনই আবার রাতারাতি একতরফাভাবে পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দিতেও কসুর করেনি। সুবিধাবাদী পাশ্চাত্য শক্তি ও রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক চরিত্রের এ এক বিশেষ ধারা ও বৈশিষ্ট। এ বিশেষ বৈশিষ্টটি পাশ্চাত্য তথা খৃষ্টান রাজনীতি ও কূটনীতির ঐতিহ্যগত ধারা বা চরিত্র। বিশ্বের মুসলিম শক্তি তথা মুসলিম উম্মাকে খৃষ্টান রাজনীতির এ বিশেষ দিকটির প্রতি অবশ্যই সদা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে নতুবা যে কোন সময় যে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।

পাশ্চাত্য শক্তি তথা পাকিস্তানের তথাকথিত মিত্রদের এতসব তালবাহানা ও ওয়াদা ভঙ্গের পরেও পাকিস্তান আজাদী লাভের পর থেকেই দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ১৯৫৮ সনে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আইয়ুব খান এমন সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহন করেন যার ফলে গোটা পাকিস্তান দ্রুতগতিতে উন্নয়নের পথে এগুতে থাকে। পাকিস্তানের আনাচে-কানাচে প্রশস্ত রাস্তাঘাট, সুউচ্চ দালান-কোঠা, সুন্দর সুন্দর স্কুল-কলেজ, আধুনিক কল-কারখানা ও বিভিন্ন ধরনের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এককথায় বলতে গেলে, পাকিস্তানে তখন উন্নয়নের জোয়ার বইতে থাকে। পাকিস্তানের এ ত্বড়িৎ ও চমকপ্রদ উন্নতি হিন্দুস্থান ও রাশিয়াসহ পাকিস্তানের শত্রুদের জন্য খুবই গাত্রদাহের সৃষ্টি করে। তারা পাকিস্তানের এ অব্যাহত উন্নতির ধারা কি ভাবে বন্ধ করে দেয়া যায় সে জন্য নানা কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। আর এ সমস্ত ষড়যন্ত্রেরই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তব রূপ ছিল ১৯৬৫ সনের হিন্দুস্থান কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমন।

ইসলামের আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে মোনাফেকরা। এ সত্য আমরা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবদ্দশা থেকে অদ্যাবধি প্রত্যক্ষ করে আস্‌ছি। আর এ জন্যই পবিত্র কোরআনে মুসলমান জাতিকে বার বার মোনাফেকদের সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মোনাফেকরাই হচ্ছে মানব জাতির নিকৃষ্টতম শ্রেণী ও ইসলামের জঘন্যতম শত্রু। এ জন্যই দোযখের আগুনের নিম্নতম স্তরে থাকবে এই মোনাফেকরা। অবশ্যি, কোরআন শরীফে ইহুদী, খৃষ্টান ও নাসারাদের সম্পর্কেও মুসলিম জাতিকে বহুবার হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা কেউ মুসলমানদের বন্ধু নয়। আর বলা হয়েছে, মুসলমানদের ভাই, বন্ধু এবং মিত্র হচ্ছে একমাত্র মুসলমানগণই। আমরা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে পবিত্র কোরআনের এ অমোঘ বানীর কঠিন বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ করি যুগে যুগে এবং দেশে দেশে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অবস্থাতে। আর এ রূঢ় সত্যটিই অতি প্রকটভাবে প্রতিভাত হয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও। ষাটের দশকে পাকিস্তান যখন উত্তরোত্তর উন্নতি আর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তার তথাকথিত মিত্র পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ এবং বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ড পাকিস্তানের এ দ্রুত উন্নতিতে বেশ ঘাবরে যায় ও বিচলিত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানকে তারা তাদের শত্রু কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে তাদের দাবার ঘুঁটি হিসাবেই শুধু ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আর এ কারণে তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য মাঝে-মধ্যে ছিটে-ফোঁটা সাহায্য দিতে তাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাই বলে পাকিস্তানের মত একটি মুসলিম দেশ এত দ্রুত উন্নতি লাভ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে এটা তাদের মোটেই কাম্য ছিল না। তার উপর আবার, পাকিস্তান সৃষ্টি থেকেই ধীরে ধীরে তার উন্নয়নের সাথে তাল রেখে গোটা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব ও স্বার্থের প্রতি দিন দিন অধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়ছিল। সর্বোপরি, এ ব্যাপারটি খৃষ্টান পাশ্চাত্য তথা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একেবারেই গ্রহনযোগ্য ছিল না। তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই তারাও ভিতরে ভিতরে পাকিস্তানকে কি ভাবে থামিয়ে দেয়া যায় সে ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। এ পথেই তাদের সাথে

www.pathagar.com

এগার

সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে ২৬শে মার্চের পরে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সামরিক শাসক লৌহ-মানব জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে আবার আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। সমাজ জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাভাবিকতা। দেশের মানুষ অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থার পরিবর্তন হলে কি হবে! হিন্দুস্থান তথা আকাশবানী এবং বৃটিশ প্রচারমাধ্যম তথা বিবিসি থেকে অবিরাম প্রচারনা চলতে থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী নির্বিচারে পাইকারীহারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে দেশের এখানে-সেখানে, এমন কি, ঢাকার রাজপথেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলছে আর এ প্রতিরোধ-যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে। এই একই ধরনের কথা ও খবর পরিবেশন করে প্রবাসী স্বাধীন বাংলা বেতার থেকেও প্রচারনা চলতে থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানী তরুণ ও যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্রসম্ভব হিন্দুস্থানে চলে যাবার জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হয়। এমনিতেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারনের একটি বিরাট অংশের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দিন দিন ঘনিভূত হচ্ছিল, তার উপর আবার এ সব প্রচারনার ফলে সাধারণ মানুষের মনে একটা ভয় ও আতঙ্ক জমে উঠতে থাকে। ফলে, দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ হিন্দুস্থান চলে যেতে শুরু করে। এভাবে, ২৬শে মার্চের পরে কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কয়েক লাখ লোক হিন্দুস্থানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করে। অবশ্য, এদের মধ্যে শতকরা প্রায় আশি জনই ছিল হিন্দু। মুসলমান যারা হিন্দুস্থানে গিয়েছিল তারা প্রায় সবাই ছিল আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী এবং আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্র, শ্রমিক ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের লোকজন। এদের অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যাবার পূর্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ লুট করে মোটা অংকের টাকাপয়সা ও সোনাদানা নিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করে কলিকাতাসহ হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী নগর ও শহরের বিভিন্ন অভিজাত হোটেলে নতুবা কোন মনোরম বাসভবনে। সেখানে তারা হিন্দুস্থানী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ থেকেও নির্দিষ্ট হারে ভাতা ও মাসোহারা পেতে থাকে এবং প্রচুর ভোগবিলাসপূর্ণ আয়েশী জীবন যাপন করতে থাকে। যা হোক, হিন্দুস্থান এ সমস্ত দেশত্যাগীদের পুঁজি করে বিদেশ থেকে মানবিক সাহায্যের নামে পর্যাপ্ত টাকাপয়সা, খাবারদাবার এবং নানাবিধ সাহায্যসামগ্রী লাভে সমর্থ হয় যার একটি বিরাট অংশই তার নিজের দেশের গরীব ও

www.pathagar.com

দুঃস্থ জনগনের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করতে থাকে। হিন্দুস্থান তার দেশে আশ্রয়গ্রহণকারী তরুণ মুসলিম যুবকদের সামরিক ট্রেনিং দেয়ার জন্য তার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু অস্থায়ী সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করে এবং সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, বিস্ফোরক ও ধবংসাত্মক দ্রবাদি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পূর্ব পাকিস্তানে ২৬শে মার্চের সামরিক অভিযানের আগে এবং পরে হিন্দুস্থানে আশ্রয়গ্রহণকারী আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে এপ্রিল মাসে একটি অস্থায়ী প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। শেখ মজিবর রহমানের অবর্তমানে এ প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করা হয় আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এবং প্রধানমন্ত্রী করা হয় তাজুদ্দিন আহম্মদকে। এঁরা দু'জনেই হিন্দুস্থানের পরম বিশ্বস্ত ও কড়া দালাল হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

১৯৭১ এর এই প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে হিন্দুস্থান তার সাথে একাধিক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করে যার মাধ্যমে হিন্দুস্থান তার ইচ্ছে ও খেয়ালখুশিমতো বাংলাদেশী মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা এবং দেশ স্বাধীন হবার পরে বাংলাদেশকে অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ ও অধিকার আদায় করে নেয়।

১৯৭১ সনের জুন মাসের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকাতে হিন্দুস্থানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত এ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য সহযোগী বাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়া পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগন এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের অভিযান চালাতে শুরু করে। অবশ্য, এ সমস্ত অভিযান সাধারণতঃ গভীর রাত্রে চালানো হতো এবং এর নেতৃত্বে ও পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে থাকতো হিন্দুস্থানী সামরিক বাহিনীর জোয়ান ও অফিসারবৃন্দ। এরা সাধারণতঃ গভীর রাত্রে সীমান্তবর্তী পাকিস্তানী এলাকায় ঢুকে পাকিস্তানপন্থী লোকজন, স্থানীয় পরিষদসমূহের মেম্বর-চেয়ারম্যান বা ধনী লোকদের বাড়ীঘর লুটপাট করতো এবং এদের খুন করতো। এ কাজের নাম দিয়েছিল তারা "অপারেশন"। পরবর্তীকালে তারা দেশের ভিতরে বিভিন্ন এলাকাতেই এ কাজ চালাতে থাকে এবং মাঝে-মধ্যে এখানে সেখানে তারা বিভিন্ন সরকারী সম্পত্তি, রাস্তার পুল ও কালভার্ট এবং কিছু কিছু থানাতেও গেরিলা হামলা পরিচালনা করতে থাকে। এভাবে অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ সত্যি সত্যি পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্বাভাবিকতা দারুণভাবেই বিঘ্নিত হয়। গোটা দেশে আবার একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। দেশ সত্যি সত্যি পাকিস্তানী প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়।

জেনারেল টিক্কা খান যতদিন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক ছিলেন ততদিন দেশ তাঁর পূর্ন নিয়ন্ত্রনেই ছিল এবং দেশের ভিতরে মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু গোলমাল বাধে যখন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে সামরিক শাসনের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক

www.pathagar.com

সরকারের দাবি উত্থাপন করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে চাপ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে একটি তথাকথিত সর্বদলীয় বেসামরিক সরকার কায়েম করে নেন তারপরে। এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা করে জেনারেল ইয়াহিয়া এক পর্যায়ে হিন্দুস্থানে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ দলীয় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের কতিপয় সদস্যদের শূন্য আসনে এক প্রহসনমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এ কাজটি একটি পাগলামী ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

অন্য দিকে, হিন্দুস্থান তার প্রচারনা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন-পরিচালনার স্বার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং জাতিসংঘে বিশেষ দূত পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কর্তৃক তথাকথিত ব্যাপক গণহত্যা ও নিপীড়নের কাহিনীর কথা প্রচার করে সাধারণভাবে মুসলিম-বিরোধী পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সরকার ও জনগনের মধ্যে পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাব আরো চাঙ্গা করে তুলতে সচেষ্ট হয়। এ সমস্ত দেশ থেকে হিন্দুস্থান তার দেশে আশ্রয়গ্রহনকারী প্রধানতঃ হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচুর টাকাপয়সা ও নানা ধরনের সাহায্যসামগ্রী লাভে সমর্থ হয়। এ ছাড়া, হিন্দুস্থান তার দেশে আশ্রয়গ্রহণকারী মূলতঃ আওয়ামী লীগ নেতাদেরও অনেককেই বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিয়ে হিন্দুস্থানী দাবি ও প্রচারনার যথার্থতা প্রমান করার উদ্যোগ নেয়। ফলে, এ সমস্ত দেশ থেকে ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত টাকাপয়সা, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং বিভিন্ন সহায়ক দ্রব্যসামগ্রী অবিরামভাবে হিন্দুস্থানে আসতে থাকে। এভাবে জুন মাসের পরে আরম্ভ হয়ে নভেম্বর মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের নামে হিন্দুস্থানী সামরিক বাহিনীর গুপ্তচরেরা আর তাদের এ দেশীয় একদল এজেন্ট শিল্পকারখানা, রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন করে। এরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই নিরিহ ধর্মপ্রান মুসলমানদের খুন করে ও তাদের বাড়ীঘর লুটপাট করে। এতে করে দেশের শান্তিপ্রিয় নিরিহ মানুষ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মতো এ সমস্ত লুটেরা বাহিনীকেও মনে মনে অপছন্দ করতে থাকে এবং এদের প্রতি ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জন্য দিন দিন জীবন বড় দুর্বিসহ হয়ে উঠতেছিল। একদিকে, তাদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ এবং পাকিস্তান-বিরোধী বিভিন্ন বিদেশী প্রচারমাধ্যমের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মী এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জেয়ানদের ঠিক আপন মনে করতে পারতেছিল না, যার ফলে সাধারণতঃ তারা এদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতো। এতে পাকিস্তানপন্থী লোকেরা এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীও এদের কাছে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সহযোগিতা না পাবার ফলে

www.pathagar.com

এদেরকে সাধারণভাবে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতো। এছাড়া, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জোয়ান যারা এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সক্রিয় ছিল এদের প্রায় সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। এ সমস্ত লোকজন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে একে অন্যের ভাষা না বুঝার বা বলতে না পারার কারনে তাদের মাঝে অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠতে আরও সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ, এ কারণেই কোন অঞ্চলে কোন সামরিক লোকজন কোন কাজে গেলে সে এলাকার অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ দূরে চলে যেতো। এতে করে সাধারণতঃ অদূরদর্শী পশ্চিম পাকিস্তানী অর্ধশিক্ষিত বা প্রায়-অশিক্ষিত জোয়ানরা মনে করতো যে, এলাকার লোকজন মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সাহায্যকারী বলেই সামরিক বাহিনী দেখে দূরে পালিয়ে গিয়েছে। ফলে, তারা অনেক সময় আহাম্মকের মতই অকারণে পলায়নপর সাধারণ মানুষদের ধরে নির্যাতন চালাতো এবং অনেক ক্ষেত্রে হত্যাও করতো। এ কাজের ফলে, দিনে দিনে এ দু'সম্প্রদায়ের মাঝে অবিশ্বাস ও সন্দেহ বেড়েই চলছিল। অবশ্যি, এ অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টির পেছনে মূল কাজ করেছে আকাশবানী ও বিবিসির মত পাকিস্তান ও মুসলিম-বিরোধী বিশ্বের বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমসমূহের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভিন্ন মিথ্যা ও কাল্পনিক কাহিনী ও প্রচারনা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানী সাধারণ মানুষের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল, অন্য দিকে, যারা মুক্তিযুদ্ধের নামে হিন্দুস্থানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে চলে এসেছিল তাদেরও অনেকেই আবার হিন্দুস্থানী সামরিক চরদের প্ররোচনায় দেশের সাধারন মানুষের উপর চাঁদা আদায় এবং বিবিধ সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য করার নামে তাদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী গুপ্তঘাতক এবং তাদের এ দেশীয় এজেন্টরা যখন তথাকথিত সামরিক অপারেশনের নামে রাত্রে বিত্তবানদের বাড়ীতে ডাকাতি, খুনখারাপি ও নানা ধরনের অত্যাচার করতে আরম্ভ করে তখন সত্যি সত্যি দেশের সাধারণ মানুষের জীবন বড়ই করুন ও দুর্বিসহ হয়ে উঠে।

যা হোক, পাকিস্তান ভাঙ্গা এবং রক্ষার অভিযান যখন এমনি সমান তালে চলছিল, মুসলিম-বিশ্ব কিন্তু তখন চুপচাপ বসে ছিল না। কিন্তু রাশিয়া, হিন্দুস্থান, জাপান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসহ মুসলিম-বিরোধী জগতের শক্তি ও সামর্থের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি ও সামরিক সাজ-সরঞ্জামে অনেক পশ্চাদপদ মুসলিম বিশ্বের সাধ ও সাধ্যের কোনই দাম ছিল না। এ ছাড়া, মুসলিম-বিশ্বের ভিতর আজ পর্যন্তও এমন কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যার ফলে তারা তাদের সমষ্টিগত বা জাতীয় কোন প্রশ্নে বা স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে বা তা বাস্তবায়নের পথে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে পারে। মুসলিম-বিরোধী বিশ্ব তাদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাধারণভাবে অনুন্নত ও অনগ্রসর এবং বিশেষ করে অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী মুসলিম জগতের মাঝে যে বিভেদ ও অনৈক্যের বীজ বপন ও লালন করে রেখেছে তার বিষময় ফল মুসলিম জগৎ ও জনগন বহুদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্তও তিক্তভাবে

www.pathagar.com

ভোগ করছে। অদ্যাবধি বহু মুসলিম দেশের বহু মুসলিম নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান বিদেশী ও বিজাতীয় স্বার্থের দালাল হিসাবে তাদের নিজ ধর্ম ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে মুসলিম জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের অপূরনীয় ক্ষতিসাধনে নিয়োজিত আছেন। এটাই হচ্ছে বর্তমান জামানায় মুসলিম-বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও সংকট।

এতসব অসুবিধা ও প্রতিকূলতার পরেও ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব, মরক্কো, জর্ডান ও ইন্দোনেশিয়াসহ প্রায় গোটা মুসলিম-বিশ্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর একটা সমঝোতা বা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তারা যে কোনভাবে পাকিস্তানের দু'অংশকে একত্রিত থাকার বা রাখার জন্য বিরামহীনভাবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু কোন আপোষ-ফয়সালা তো আর এক পক্ষের ইচ্ছায় সম্ভব নয়। পাকিস্তানপন্থীরা রাজী থাকলে কি হবে, আওয়ামী লীগ নেতারা যে একেবারেই আপোষহীন অনড়। অবশ্যি, কোন আপোষ-নিষ্পত্তিতে আসার কোন শক্তি বা ক্ষমতাও সত্যি সত্যি তখন তাদের ছিল না। কারণ, তারা তো তখন সত্যিকার অর্থে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান-বিরোধী শক্তিসমূহের হাতে একপ্রকার বন্দীই ছিলেন। তখন আওয়ামী লীগ নেতারা ছিলেন হিন্দুস্থানের হাতের পুতুল মাত্র-কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না।

পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলনে দুনিয়ার মাত্র দু'টি মুসলিম দেশ ইসলাম ও মুসলিম-বিরোধী বিশ্বের শিখন্ডী ও দালাল হিসাবে সক্রিয় ছিল। এ দু'টি দেশেরই শাসকরা তখন রাশিয়া ও হিন্দুস্থানের বিশ্বস্ত চর হিসাবে তাদের দেশের জনগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের দেশে কম্যুনিজম তথা নাস্তিকতাবাদ প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত ছিল। মুসলিম দুনিয়ার সাথে এদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এরা তাদের বন্ধু ও প্রভু মনে করতো রাশিয়াসহ বিশ্বের সমস্ত নাস্তিক ও ইসলাম-বিরোধী দেশসমূহকে। অবশ্যি, পরবর্তীকালে এ দেশ দু'টির জনগণকে এ জন্যে অনেক খেসারত দিয়ে হয়েছে। বিভ্রান্ত এ দেশ দু'টি ছিল ইরাক ও আফগানিস্তান। এ দেশ দু'টি আজও নানা বিপর্যয়ের মাঝে কালাতিপাত করছে।

এহেন অবস্থার মাঝে ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাস নাগাদ গোটা পূর্ব পাকিস্তান মূলতঃ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে, পাকিস্তানপন্থী একদল, যাদের সাথে ছিল মূলতঃ মুসলিম লীগের ৩টি উপদল, পিডিপি, জামায়াত-ই-ইসলামী ও নেজাম-ই-ইসলামীর নেতা ও কর্মীবৃন্দ এবং তাদের সহায়ক সশস্ত্র বাহিনী, রাজাকার বাহিনী, আলবদর বাহিনী, আল-সাম্স বাহিনী, মুজাহিদ বাহিনী ও আনসার বাহিনী। অন্য দিকে ছিল, হিন্দুস্থান ও রাশিয়াপন্থী এবং সাধারণভাবে ইসলাম-বিরোধী বিশ্বের মদদপুষ্ট একটি গোষ্ঠী যারা মূলতঃ ছিল আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (প্রধানতঃ রাশিয়াপন্থীরা), কম্যুনিষ্টপন্থী শিবির ও বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠী এবং

www.pathagar.com

এদের সশস্ত্র বাহিনী হিসাবে কাজ করতো প্রধানতঃ হিন্দুস্থান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সামরিক সাহায্যপুষ্ট ১৯৭১ এর মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও গেরিলা বাহিনী। এদের ভিতর মুজিব বাহিনীতে ছিল মূলতঃ যারা আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের একেবারেই খাস লোকজন। এরা নামে অনেক ভারী থাকলেও কামে তেমন কোথাও ছিল না। এরা প্রধানতঃ কলিকাতাসহ হিন্দুস্থানের বিভিন্ন শহরে বসে আরাম-আয়েশ এবং হারামীতে ব্যস্ত ছিল। ১৯৭১ এর মুক্তিবাহিনীতে অবশ্যি আরেকটি গোষ্ঠী ছিল। এরা সাধারণভাবে হিন্দুস্থানে গিয়ে ট্রেনিং না নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বসেই পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের দলত্যাগী ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী অফিসার ও জোয়ানদের কাছে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে পুর্ব পাকিস্তানেরই বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগনের মাঝে লুকিয়ে থাকতো এবং সময় ও সুযোগ বুঝে গেরিলা হামলা পরিচালনা করতো। সত্যিকার অর্থে, এরাই ছিল আসল মুক্তিবাহিনী এবং এরা মনেপ্রাণেই দেশকে ভালবাসতো। এরা, তাদের ভাষায়, স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করেছিল। কিন্তু এরা হিন্দুস্থানের গোলাম হওয়ার জন্য পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতে চায়নি। এরা ভাল করেই জানতো যে, হিন্দুস্থান আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করছে না, হিন্দুস্থান আসলে তার ঘোরতর দুশমন পাকিস্তানকে বিভক্ত ও দু'অংশ বিচ্ছিন্ন করার জন্য কাজ করছে এবং একবার পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতার নামে আলাদা করতে পারলে বাংলাদেশকে নিষ্ঠুর শোষনের ক্ষেত্র হিসাবেই ব্যবহার করবে; আর, যদি সম্ভব হয়, তা হলে এ অঞ্চলটিকে পুরোপুরি গ্রাস করতেও সে দ্বিধাবোধ করবে না। ১৯৭১ এর মুক্তিবাহিনীর এ গোষ্ঠীটি তাই মনেপ্রাণে হিন্দুস্থানকে ঘৃণাই করতো।

১৯৭১ এর মুক্তিবাহিনীর এ অংশটি যে সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক ছিল তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। তবে তারা হিসেবে যে একটু ভুল করেছিল এবং মারাত্মক অবাস্তববাদী ছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারণ, উপমহাদেশের মুসলমানদের জঘন্য দুশমন হিন্দুস্থানের পরামর্শে হিন্দুস্থানেরই সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করে একদিকে বঙ্গোপসাগর আর একদিকে ব্রম্মদেশের সামান্য একফালি সীমান্ত ছাড়া তিন দিক থেকে পুরোপুরি হিন্দুস্থান দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে পরিবেষ্টিত হয়ে হিন্দুস্থানের বিরোধিতা করে তার ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুর শোষন থেকে রেহাই পাওয়ার শক্তি ও সামর্থ যে বাংলাদেশের নেই তা বাংলাদেশের জন্য সমর্থক ও সংগ্রামরত ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের এ অংশটি তখন বুঝতে পারেনি। বাংলাদেশ সৃষ্টির সাথে সাথে ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের এ অংশটি এ রূঢ় বাস্তবটি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানী দালাল ও পুতুল সরকারের আমলে এদেরকে এ ভুলের জন্য চড়া মাশুলও দিতে হয়েছে।

১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের এ অংশটি দিন দিন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হচ্ছিল। আর অন্য দিকে, যারা হিন্দুস্থানে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এ দেশে এসে জনগনের জানমাল,

www.pathagar.com

কল-কারখানা, রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছিল তাদের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষ দিন দিন বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতেছিল। কারণ, জনসাধারণ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যে, হিন্দুস্থান বা অন্য যে কোন প্রচারমাধ্যম থেকে যাই বলা হোক না কেন, পাকিস্তান সরকার বা তার নিয়ন্ত্রিত বাহিনীর লোকজন দেশের কল-কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও পুল-কালভার্টসহ দেশের সমস্ত জাতীয় সম্পদ রক্ষা করার জন্য নিরলস জানকবুল কাজ করে যাচ্ছে অথচো হিন্দুস্থান থেকে তার চরেরা এসে তা যথেচ্ছ ধ্বংসসাধনে ব্রতী হচ্ছে। তাই এর পরে আর তাদের কারো কাছ থেকে শুনার বা বুঝার দরকার ছিল না যে, কারা দেশপ্রেমিক আর কারা বিদেশী চর।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের এই নগ্ন হস্তক্ষেপ ও বেপরোয়া গর্হিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্বসম্প্রদায়কে অবহিত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য পাকিস্তান যে কোন চেষ্টাই করেনি তা নয়। তবে তার সে প্রচেষ্টা হিন্দুস্থানের তুলনায় যে নিতান্তই অপ্রতুল ছিল তাতেও কোন সন্দেহই নেই। সর্বোপরি, যে মুসলিম-বিরোধী বিশ্ব ও শক্তি তলে তলে সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য নিজেরাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছিল তাদের আবার পাকিস্তান কি ভাবে কি কথা বুঝাবে বা কি ব্যবস্থা গ্রহন করাবে? তাই পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত দূত ও মিশনসমূহ শত চেষ্টা করেও মুসলিম-বিরোধী বিশ্বশক্তিকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার আহবানে সার্থকভাবে সমর্থন আদায়ে সফল হতে পারেনি- সফল হবার কোন প্রশ্ন তো আসলেই উঠে না। তাই বহুবার জাতিসংঘে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নিমিত্তে একটি রাজনৈতিক সমাধানের উপায় উদ্ভাবন ও হিন্দুস্থানকে সরাসরি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সক্রিয় নগ্ন হস্তক্ষেপ করতে বারন করে বিপুল ভোটে বহু প্রস্তাব পাশ ও গ্রহন করার পরেও হিন্দুস্থান তার কুকর্ম থেকে ক্ষনিকের জন্যও বিরত থাকেনি। চানক্য কূটনীতির অনুসারী চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান এ উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের প্রায় তের শত বছরের পরে তার চরম শত্রু মুসলমানদের জব্দ ও ঘায়েল করার যে অপ্রত্যাশিত সুযোগ হাতে পেয়েছে তা সে হাতছাড়া করে কি করে! আর তা ছাড়া, তার এ কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য তো তখনকার দিনে সামরিক দিক থেকে বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর দেশ রাশিয়াও যে পুরোপুরিই তার সাথে আছে। এ ছাড়া, মুখে যাই বলুক, মুসলিম-বিরোধী গোটা পাশ্চাত্য জগতের সাহায্য ও সমর্থনও তো সে পাচ্ছে তলে তলে। তা হলে আর হিন্দুস্থানের ভয় কিসের?

এ অবস্থায় হিন্দুস্থান আর দেরী করতে রাজী ছিল না। কারণ, সময় বয়ে গেলে ঝুঁকি আছে। হিন্দুস্থানে আশ্রয়গ্রহনকারী সাধারণ মানুষ এমন কি বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীও ইতিমধ্যেই হিন্দুস্থানের আসল মতলব ও উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছিল। তাই হিন্দুস্থানে আশ্রয়গ্রহনকারী ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে কয়েকদফা ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহন করে দলে দলে বহু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসতে শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে বহু আওয়ামী লীগ এম এন এ ও এম পিও দলত্যাগ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশপূর্বক ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করে পাকিস্তান সরকারের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

তাই আর দেরী নয়। হিন্দুস্থান এবার বেপরোয়া হয়ে তার হীন মতলব ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে উঠে চরম আঘাত হানে। মরনকামড় দেয় হিন্দুস্থান। ১৯৭১ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর সহসা হিন্দুস্থান সরাসরি পাকিস্তান আক্রমন করে বসে। নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনী নিয়ে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের উভয় অংশের উপর চড়াও হয়। মুসলিম-দুনিয়া ও জাতিসংঘসহ গোটা বিশ্বের সমস্ত আবেদন-নিবেদন, প্রস্তাব-সিদ্ধান্ত ও রীতি-নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে হিন্দুস্থান তার সর্বশক্তি দিয়ে তার বদমতলব চরিতার্থ করার কাজে সদম্ভে এগিয়ে যায়। এ অবস্থায় পাকিস্তান ও মুসলিম-বিশ্বের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুস্থান ও রাশিয়াসহ মাত্র গুটিকতক দেশের বিরোধিতার মাঝে প্রায় সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের জোর দাবির প্রেক্ষিতে হিন্দুস্থানের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহবান জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয় জাতিসংঘে এবং যুদ্ধ নয়, আলোচনার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য উভয় পক্ষকে তাগিদ দেয়া হয়। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী-হিন্দুস্থান অনড়, হিন্দুস্থান বেপরোয়া। হিন্দুস্থান পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর জঘন্য বর্বর হামলা চালিয়ে এগুলির ধ্বংসসাধনে মারাত্মক তৎপরতা চালাতে থাকে। অন্য দিকে, হিন্দুস্থানের দোসর রাশিয়া পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভিতরকার এ গোলমালে হিন্দুস্থানকে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দিতে থাকে। হিন্দুস্থান-রাশিয়াসহ বিশ্বের মুসলিম-বিরোধী শক্তিগুলি ছিল তখন একেবারেই বেপরোয়া।

১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার মত শক্তি ও সামর্থ্য পাকিস্তানের নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এক হাজার মাইল ব্যবধানে বিভক্ত দু'টি অঞ্চলকে এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা ও হিন্দুস্থানের হামলা থেকে বাঁচাবার মত অবস্থা তখন পাকিস্তানের ছিল না। আর তা ছাড়া, এ হামলায় হিন্দুস্থান তো একা ছিল না। তার পাশে সক্রিয়ভাবে রাশিয়াসহ গোটা মুসলিম-বিরোধী বিশ্বই তো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের পাশে সামরিক দিক থেকে দুর্বল ও অনেক পশ্চাদপদ মুসলিম বিশ্ব ছাড়া তো সত্যিকার অর্থে আর কেউই ছিল না। মুখে যাই বলুক, বাস্তবে পাকিস্তানের তথাকথিত বন্ধু চীন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কেউই কোন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেনি। তাই যা হবার তাই হল। মাত্র তের

www.pathagar.com

দিনের যুদ্ধেই পাকিস্তান হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। হিন্দুস্থান-রাশিয়ার হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা আর সম্ভব হলো না। আসলে, রক্ষা করার কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, বহুদিন আগে থেকেই কার্যতঃ পূর্ব পাকিস্তান হিন্দুস্থানী হামলার শিকার হয়ে এক অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং হিন্দুস্থানের এ অঘোষিত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে হিন্দুস্থানী সহায়ক বাহিনী কাজ করছিল। সুতরাং, এ যুদ্ধ বাস্তবিকপক্ষে মাত্র তের দিনের ছিল না। আসলে, এ যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয়-দশ মাসের। এ যুদ্ধে একদিকে ছিল মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারনের একটি অংশ এবং সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও দুর্বল মুসলিম বিশ্ব। আর অন্য দিকে, পাকিস্তানের (মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের) বিরুদ্ধে ছিল লোকসংখ্যার দিক থেকে প্রায় পাঁচগুন বড় হিন্দুস্থান, পূর্ব পাকিস্তানী জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ এবং তখনকার দিনে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তিধর দেশ সোভিয়েত রাশিয়াসহ মুসলিম-বিরোধী গোটা উন্নত পাশ্চাত্য জগৎ। তাই সত্যি সত্যি পাকিস্তানের করার কিছুই ছিল না। এর পরেও অবশ্যি, ইচ্ছে করলে পাকিস্তান আরও বহুদিন এ সংঘাত জিয়িয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু তাতে লাভ হতো হিন্দুস্থানেরই। তা হলে, হিন্দুস্থান এ সময়ের ভিতর পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের নামে এ দেশের সমস্ত শিল্পকারখানা, রাস্তাঘাট, শহর-বন্দর ও সেতু-ব্রিজসমূহ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে গোড়া থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে পঙ্গু করে দিতো এবং তার ফলে শুরু থেকেই বাংলাদেশকে শোষন করার সুযোগ পেতো। কিন্তু যুদ্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে চাইলেও পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের কোন নেতা বা সরকারই চাননি যে, যুদ্ধের সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতি বা জনপদকে হিন্দুস্থান দীর্ঘদিনের ধ্বংসের সুযোগ পেয়ে একেবারেই শেষ করে দিক। তাই পাকিস্তানের দু'অংশের নেতাদের সমষ্টিগত চিন্তা ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফল হিসাবেই ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের আঞ্চলিক সেনাপতি জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বে হিন্দুস্থানী হামলায় নেতৃত্বদানকারী হিন্দুস্থানী পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিপতি জেনারেল অরোরার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার রমনা "রেসকোর্স" ময়দানে অস্ত্রসম্বরন ও আত্মসমর্পন করে। এ সময়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক দলিলের শর্তানুসারে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

এমনি অবস্থা ও এ সমস্ত তালবাহানার মাঝেই হিন্দুস্থান-রাশিয়াসহ মুসলিম-বিরোধী দুনিয়ার সরাসরি হামলা ও সক্রিয় বিরোধিতার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার পঞ্চম বৃহৎ এবং মুসলিম-বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি আর বিশ্বের মুসলমানদের আশাভরসার কেন্দ্রস্থল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার প্রতীক বহু ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে অর্জিত নেয়ামত পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরো

www.pathagar.com

হবার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে হিন্দুমানসে লালিত এতদঞ্চলে একটি অখন্ড ব্রাহ্মন্যবাদী রাষ্ট্র কায়েমের হিন্দুস্থানী স্বপ্ন ও নীলনক্সা সামনে রেখে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তান দীর্ঘ নয় মাস ভাইয়ে ভাইয়ে বেদনাদায়ক হানাহানি আর মর্মান্তিক খুনাখুনির করুন পরিনতি শেষে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় চারিদিক থেকে চিরন্তন মুসলিম শত্রু হিন্দুস্থানী অক্টোপাস দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনজড়িত হয়ে একটি আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলিম-বিশ্বের জন্য রচিত হলো এক নজীরবিহীন কলঙ্কজনক ইতিহাস। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তানুসারে ওই দিন শুধু উপমহাদেশ নয়, গোটা মুসলিম-বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম বিজাতীয় শত্রুর কাছে হার মেনে প্রায় নব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য তথা মুসলিম মুজাহিদ তাদের চিরন্তন ও ঐতিহ্যবাহী শত্রু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে অংশীবাদিতে বিশ্বাসী মূর্তিপূজারী হিন্দুস্থানী সৈন্যদের নিকট পরাজয় মেনে নিয়ে হিন্দুস্থানের পূর্বাঞ্চলীয় রনাঙ্গনের সামরিক প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে অস্ত্রসমর্পণ করে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। মুখে যে বা যারা যত গলাবাজিই করুক না কেন, ১৯৭১ সনের যুদ্ধ যে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান যুদ্ধ ছিল এবং এ যুদ্ধে হিন্দুস্থান যে তার এ দেশীয় কতিপয় মিত্র ও সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে গায়ের জোরে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একটি আশ্রিত রাজ্য বা নব্য উপনিবেশের মর্যাদা দিয়ে, দয়া করে, বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে দিয়েছিল তা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পাকিস্তান-হিন্দুস্থান যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তানুসারে হিন্দুস্থানের কাছে ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমর্পনের যথার্থ বাস্তবতার মধ্যেই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে আছে। ওই চুক্তিতে শুধু এবং শুধুমাত্র হিন্দুস্থানী এবং পাকিস্তানী পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সামরিক অধিনায়করাই স্বাক্ষর করেছিল, যা হচ্ছে একটি বাস্তব আন্তর্জাতিক দলিল, কারো মনগড়া উক্তি বা পাগলের প্রলাপ নহে। ওই চুক্তিতে এ দেশের স্বঘোষিত কোন জেনারেল বা তথাকথিত কোন যৌথ সামরিক কমান্ডের বাংলাদেশী কোন অংশীদার স্বাক্ষর করেনি বা করার প্রশ্নও উঠেনি। যা হবার তাই হয়েছে। অযথা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আজও বোকা বানাবার চেষ্টা করে কি লাভ! সে যতদিন পরেই হোক, ইতিহাস একদিন সত্য কথা বলবেই। ১৯৭১ সনের পর থেকে হিন্দুস্থান প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বরকে সাড়ম্বরে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের বিজয় দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। ১৯৭১ সনের এ বিজয়ের পরে তৎকালীন হিন্দুস্থানী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্ধিরা গান্ধী দিল্লীর দরবারে আয়োজিত বিজয় উৎসব এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী হিন্দুস্থানী জেনারেলদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যথার্থই বলেছিলেন- "হাজার সাল কা বদলা লে লিয়া হাম।"

তা ছাড়া, সেই ঐতিহাসিক আম্রকাননে বসে হিন্দুস্থানের সাথে এ দেশের স্বঘোষিত স্বাধীন মুজিবনগর সরকার যে চুক্তিটি করেছিলেন তার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থ ও

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যে কতখানি বিসর্জন দেয়া হয়েছে বা ওই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের আদৌ কোন স্বাধীন মর্যাদা আছে কিনা তা সত্যিই অনুধাবনযোগ্য। যতদিন হিন্দুস্থান বা বাংলাদেশ সরকার কেউ এ গোপন চুক্তিটি এবং যুদ্ধকালীন সময়ে হিন্দুস্থানে বসে তথাকথিত অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ও হিন্দুস্থানের মধ্যে স্বাক্ষরিত অন্যান্য দাসখতগুলো প্রকাশ না করবে ততদিনে ঠিক বুঝা যাবে না যে, মুসলিম বাংলার আকাশে উড্ডীয়মান ওই স্বাধীন বাংলাদেশী জাতীয় পতাকার সত্যিকার মর্যাদাই বা কি। তবে সব কিছু বাদ দিয়ে ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাক্ষরিত তথাকথিত "হিন্দুস্থান-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তির" নামে যে গোলামীর জিঞ্জির বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর পরিয়ে দেয়া হয়েছিল তাতেই এটা আয়নার মত পরিস্কার যে, স্বাধীন সত্তা বলে বাংলাদেশের বাকী কোন কিছুই আর বেশী ছিল না। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়, বাংলাদেশকে বড়জোর একটি আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদাযুক্ত হিন্দুস্থানের একটি বিশেষ উপনিবেশ বই অন্য কোন কিছু বলার বা ভাবার কোন অবকাশ আর ছিল না ওই চুক্তির পরে।

www.pathagar.com

বার

পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো সত্যি কিন্তু এ জন্য মূল্য দিতে হলো অনেক। অগণিত মানুষ মারা গেলো এ যুদ্ধে। সত্যি সত্যি কত লোক মারা গিয়েছে তার সঠিক হিসাব হয়নি কোনদিন। যতদূর জানা গিয়েছিল তাতে মনে হয়, কমপক্ষে প্রায় তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল এ যুদ্ধে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে গোড়ার দিকে আওয়ামী লীগ সরকার একবার এর খতিয়ান নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। তখনকার দিনের সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত এক জরীপে দেখা গিয়েছিল যে, ১৯৭১ সনের এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজারের মত আদমসন্তান প্রান হারিয়েছিল। তবে এ যুদ্ধের সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক এই ছিল যে, হিন্দুস্থান কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত এ যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল তারা প্রায় সবাই ছিল মূলতঃ মুসলমান। সাধারণভাবে, কোন হিন্দু ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়নি বা মারা যায়নি। আরও মজার ব্যাপার ছিল, এ যুদ্ধে যদি সত্যিই প্রায় তিন লক্ষ লোক মারা গিয়ে থাকে তা হলে অন্ততঃপক্ষে দুই লক্ষাধিক লোক মারা গিয়েছিল হিন্দুস্থানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর একজাতীয় তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর হাতে এবং এদের সবাই ছিল অবশ্যই মুসলমান। ১৯৭১ সনের জুন মাস থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় যখন তথাকথিত গেরিলা হামলা বা গুপ্তহত্যা আরম্ভ করা হয় তখন থেকে ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখ হিন্দুস্থানী সামরিক বাহিনীর কাছে পূর্ব পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পন পর্যন্ত তথাকথিত সমস্ত অপারেশন বা হত্যাযজ্ঞের শিকার ছিল সবাই মুসলমান। অপারেশনের নামে এ সময় ওই সব মুক্তিবাহিনী বা হিন্দুস্থানী অনুচরেরা প্রধানতঃ দেশের বিশিষ্ট, বিজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং পরিনামদর্শী মুসলমান জনগোষ্ঠীকে হত্যা করতে থাকে। তবে এদের হাতে সবচেয়ে বেশী মুসলমান মারা গিয়েছে ১৯৭১ সনের তথাকথিত বিজয়ের একেবারে পূর্বমুহূর্তে। এ সময়ে পাকিস্তান সমর্থক জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশই জিলা, মহাকুমা বা থানা সদরে আশ্রয় নিয়ে রাজাকার, আল-বদর ও আল-শাম্‌সসহ বিভিন্ন পাকিস্তানপন্থী জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এভাবে এক একটি থানা, মহাকুমা বা জেলা শহর দখল করার সাথে সাথে ১৯৭১ এর মুক্তিবাহিনীর হাতে বেশুমার মুসলমান মারা যায়।

অপর দিকে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বা তাদের সহায়ক জঙ্গী বাহিনীগুলির হাতে যারা মারা গিয়েছিল তার প্রায় আশি শতাংশই ছিল মূলতঃ হিন্দু জনগোষ্ঠী। এরা সাধারণভাবে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পাক বাহিনীর নির্বোধ হত্যার শিকার হয়েছিল। পাক

www.pathagar.com

বাহিনীর হাতে নিহত বাকী বিশ শতাংশ মুসলমানদের অধিকাংশই মারা গিয়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ও শেষ দিকে এবং এ ভ্রাতৃহত্যার মূল কারণই ছিল দেশের দু'অঞ্চলের লোকদের ভিতর ভাষাগত ব্যবধান ও তজ্জনিত ভুলবুঝাবুঝি ও সন্দেহ যা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

যা হোক, ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ ও বিজয়ের পরে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে চলতে থাকে অবাধ হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও নারীধর্ষন। বিগত নয় মাসে যারা হিন্দুস্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবার তারা দেশে ফিরে এসে তাদের প্রতিপক্ষ এবং ব্যক্তিগত শত্রুদের উপর নির্মমভাবে চড়াও হয়ে নির্বিচারে হত্যা, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারীধর্ষন চালাতে থাকে। আর এ জঘন্য ও বর্বর কার্যকলাপের পাইকারী ও নির্বিচার শিকার ছিল বিভিন্ন পাকিস্তানপন্থী জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ শ্রেণীগতভাবে তথাকথিত বিহারী বা মোহাজের জনসাধারণ। অথচো, এই অবাঙালী জনগণ পাকিস্তান আন্দোলনের নিষ্ঠুর শিকার হয়েই একদিন তাদের মা-বাপ, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজন এবং বাড়ীঘর, ধন-সম্পদ ও যথাসর্বস্ব হারিয়ে বর্বর ব্রাহ্মন্যবাদী দাঙ্গার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য তাদের কোরবানীর ফসল ও তাদের স্বপ্নসাধের দেশ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের একমাত্র দোষ ছিল, তারা তাদের আশ্রয়স্থল এবং প্রিয় আবাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে চেয়েছিল তাদের জানী-দুশমন হিন্দুস্থানের হাত থেকে। এ কাজে অবশ্য তারা কেউ কেউ একটু যে বাড়াবাড়ি করেছিল তা ঠিক। তবে কারো কারো ব্যক্তিগত সে অন্যায়ের জন্য পাইকারীহারে গোটা মোহাজের জনগোষ্ঠীর উপর এ বর্বর ও অমানুষিক জুলুম চালাবার বা আইন হাতে তুলে নিয়ে নির্বিচারে তাদের হত্যা ও ধর্ষন করার বা তাদের বাড়ীঘর ও সহায়সম্পদ লুটপাট করার বা পুড়িয়ে দেয়ার কোন যুক্তি আছে বলে আমাদের মনে হয় না। যা হোক, এই মোহাজের শ্রেণীর উপর তথাকথিত বাঙালীদের এহেন নির্বিচার ও ব্যাপক জুলুম চলতে থাকে বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে বহু বছর ধরে। এ সমস্ত লোকদের জোর করে তাদের বাড়ীঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তা এ দেশের তথাকথিত মুক্তিবাহিনী নামধারী লোকজন অদ্যাবধি জবরদখল করে আছে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন সরকারই এর কোন প্রতিকার করেনি বা করার কোন প্রয়োজনও মনে করেনি।

বাংলাদেশে যখন এমন অরাজক অবস্থা চলছিল, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। অন্য দিকে, পাক-ভারত যুদ্ধ শেষে হিন্দুস্থানের কাছে আত্মসমর্পনকারী পূর্ব পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লোকলস্করগণ সবাই তখন হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জেলে বন্দীজীবন যাপন করছে। আর এমনি এক মুহূর্তে বিজয়ী হিন্দুস্থানী সৈন্যবাহিনী সদর্পে বিচরণ করছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ গোটা দেশের বিভিন্ন এলাকায়। হিন্দুস্থানী জোয়ান ও অফিসারগণ বাংলাদেশে এসে এখানকার উন্নয়ন ও শিল্পকারখানাসমূহ প্রত্যক্ষ করে তাজ্জব হয়ে যায় এবং প্রায়শঃই

www.pathagar.com

তাদের দেশের তুলনায় বাংলাদেশকে একটি স্বর্গভূমি আখ্যায়িত করে তাদের মিত্র ও দোসর ১৯৭১ এর মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের লোকজনদের গাদ্দার বা বেঈমান বলে গালাগাল দিতে থাকে। এর ফলে, মাঝে মাঝে কিছুটা অপ্রীতিকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়।

তবে এখানেই এর শেষ নয়। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের সাথে সাথে হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনাছাউনি থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং অন্যান্য সমস্ত মালামাল, এমন কি ফুলের টবটি পর্যন্ত এ দেশের বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক ট্রাক ও গাড়ী বোঝাই করে হিন্দুস্থানে নিয়ে যায়। এ ছাড়া, হিন্দুস্থানী সৈন্যরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও বাঙালী জনগণের প্রতি তাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের আন্তরিক নিদর্শনস্বরূপ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন কল-কারখানা থেকে ব্যাপকহারে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ-এমন কি, কারখানার চুল্লির চিমনীটি পর্যন্ত খুলে নিয়ে যেতে থাকে বাংলাদেশেরই বিভিন্ন যানবাহন এবং রেলগাড়ী বোঝাই করে। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক এ দেশের অগণিত অজ্ঞ, মূর্খ ও অপরিনামদর্শী লোকজন তাদের হিন্দুস্থানী মিত্রবাহিনীর এ অপূর্ব বন্ধুত্বের স্পষ্ট নিদর্শনে একেবারেই হতবাক হয়ে যায়। এবার তারা তাদের হিন্দুস্থানী মিত্রদের আসল উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তখন করার যে তাদের আর কিছুই ছিল না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনীর এমনি ব্যাপক লুটপাটের মাঝে একদিন এ দেশের কৃতি সন্তান মুক্তিবাহিনীর গৌরব মহান যোদ্ধা মেজর এম.এ. জলিল রুখে দাঁড়ান। তিনি খুলনার বিভিন্ন কারখানা থেকে লুটে নেয়া যন্ত্রাংশ বোঝাই হিন্দুস্থানগামী গাড়ী আটক করার নির্দেশ দেন তাঁর অধীনস্ত বাহিনীর লোকজনদের। ফলে, হিন্দুস্থানী সৈন্যদের সাথে মেজর জলিলের বাহিনীর গোলাগুলি ও খুনাখুনি হয়। এর ফলে, মেজর জলিলকে তাঁর এ দেশপ্রেমের পুরস্কারস্বরূপ হিন্দুস্থানের ক্রীড়নক পুতুল সরকার কারাগারে বন্দী করে। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মহান স্বীকৃতি ও আদর্শ পুরস্কার হিসাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলই পেলেন প্রথম সরকারী 'প্রতিদান'। যা হোক, এ ঘটনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এ দেশের দামাল সন্তান সত্যিকার দেশপ্রেমিক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে। কিন্তু তাদের করার তখন আর কি ছিল? গোটা দেশের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ যে তখন হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী এবং হিন্দুস্থানেরই ক্রীড়নক পুতুল আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে।! এ অক্টোপাসের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার বা নিজেদের বাঁচার ক্ষমতা যে মুষ্টিমেয় দেশপ্রেমিক এ মুক্তিযোদ্ধাদের নেই। তাই এ অবস্থায় অসহায়ের মত মাথা খুঁড়ে মরা ছাড়া কোন উপায় ছিল না তাদের।

হিন্দুস্থানী সৈন্যবাহিনী যখন অবাধে এমন লুটপাট ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল

www.pathagar.com

এবং এ দেশীয় বিভীষনরা তাদের অকুণ্ঠ ও আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিল এমনি এক মুহূর্তে ইতিমধ্যে দেশের সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত উপমহাদেশের মুসলমানদের অপূরনীয় ক্ষতি ও সর্বনাশের আরেক হোতা শেখ মুজিবের অন্যতম দোসর পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে শেষ সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেন। শেখ মুজিবকে মুক্তি দিবার জন্য ভুট্টোকে অনেক সভাসমাবেশের আয়োজন করে তাঁর দেশের লোকজনদের বুঝাবার চেষ্টা করতে হয় এবং এ জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত অনেক মূল্যও দিতে হয়। শেখ মুজিব এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো, দু'জনারই লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা। এ জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করতে তাদের কারুরই কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা ছিল না। দেশ বা জাতি তাদের ক্ষমতার পথে কোন বাধা বা আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। এ দুই ক্ষমতালোভী ও গদির মোহে অন্ধ ইয়াজিদের জন্যই উপমহাদেশের মুসলমানদের বুক থেকে ঝরেছে অনেক তাজা রক্ত এবং এদের দু'য়ের বেঈমানীরই তিক্ত ফল ভোগ করছে আজকে উপমহাদেশের গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠী। এদের অপকর্মের খেসারত দিতে হবে এখানকার মুসলমানদের অনেক দিন ধরে।

জেল থেকে ছাড়া পেয়েই শেখ মুজিব লন্ডন হয়ে হিন্দুস্থানের রাজধানী নয়াদিল্লী যান তাঁর প্রভু হিন্দুস্থানী শাসকদের সালাম জানাবার এবং দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর মনিবদের নির্দেশ গ্রহন করার জন্য। ইতিমধ্যে, লন্ডনে বসে তিনি এক কান্ড করে বসেন। জানা নেই, শুনা নেই, কারো সাথে কোন আলোচনা নেই, হঠাৎ শেখ মুজিব সাংবাদিকদের কাছে বলে বসলেন যে, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ৩০ লক্ষ বাঙালী প্রাণ দিয়েছে। যুদ্ধের পুরো নয় মাস পাকিস্তানের জেলে থেকে এবং দেশে কোন জরিপ বা হিসাব-নিকাশ না নিয়েই বাংলাদেশের মাটিতে অবতরণের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান থেকে বিমানপথে লন্ডনে বসেই শেখ মুজিব এ হিসাব পেলেন কোথায় বা কি করে এমন একটি মারাত্মক নাজুক প্রশ্নের ফয়সালা একা একাই করে দিলেন সেটা বড়ই তাজ্জব ব্যাপার। অবশ্যি, নিন্দুকেরা বলে থাকেন, শেখ মুজিব নাকি তেমন লেখাপড়া জানতেন না। সে জন্য তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁকে ঠাট্টা করে "Illiterate Graduate" বা মূর্খ গ্রাজুয়েট বলে সম্বোধন করতেন। আর এ কারণেই নাকি শেখ মুজিব লন্ডনের পথে বিমানে বসে তাঁর সফরসঙ্গী কার কাছে জিজ্ঞেস করে শুনেছিলেন যে, প্রায় তিন লাখ লোক যুদ্ধে মারা গিয়েছে এবং এর ফলে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তিন লাখের বদলে তিন মিলিয়ন, অর্থাৎ ত্রিশ লাখ বলে ফেলেছিলেন। কারণ নাকি ছিল, তথাকথিত মূর্খ গ্রাজুয়েট শেখ মুজিব লাখ আর মিলিয়নের ভিতর অর্থগত পার্থক্য জানতেন না। সত্যি সত্যি জানা না থাকলে এমন ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

দেশে এসেই শেখ মুজিব পাকিস্তান এবং পাকিস্তানপন্থীদের কঠোর ভাষায়

www.pathagar.com

গালাগালি করতে শুরু করেন। অন্য দিকে, তিনি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুস্থানী সাহায্য ও সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করে হিন্দুস্থানী সরকার এবং বিশেষ করে তদানিন্তন হিন্দুস্থানী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গুণকীর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। যুদ্ধের পরে হিন্দুস্থান যে হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, সোনা-দানা, শিল্পকারখানার যন্ত্রাংশ, গাড়ী-ঘোড়া, ট্রাক-রেলগাড়ী, এবং বিবিধ পন্যসামগ্রীসহ বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছে সে ব্যাপারে শেখ মুজিব একেবারেই মুখ খুললেন না বা টু শব্দটি পর্যন্তও করলেন না। শেখ মুজিবের এহেন কান্ডকারখানা দেখে দেশের মানুষ অনেকটা হতবিহবল হয়ে গেল।

শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলেন ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারী। তখনও বাংলাদেশ পুরোপুরিই হিন্দুস্থান বা হিন্দুস্থানী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশে তখন একটি পুতুল সরকার ছিল ঠিকই এবং শেখ মুজিবই তার প্রধান কিন্তু তাদের সত্যিকার কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ ছিল তখন সত্যিকার অর্থে হিন্দুস্থানেরই একটি অংশ মাত্র।

এ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে শেখ মুজিব হিন্দুস্থান সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ থেকে তাদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু শেখ মুজিব বল্লেই বা চাইলেই তো হবে না। ইতিমধ্যে, তাঁর অবর্তমানে তথাকথিত মুজিবনগর তথা আম্রকানন সরকারের সাথে যে হিন্দুস্থান এক দাসত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করায়ে নিয়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম প্রহরেই। আর এ চুক্তির শর্তানুসারে ১৯৭১ এর বাংলাদেশ সরকারের হাত-পা যে হিন্দুস্থানের কাছে একেবারেই বাঁধা। হ্যাঁ, তবুও ভদ্রতা এবং ব্রাম্মন্যবাদী চানক্য-কূটনীতি বলে একটা কথা তো আছে হিন্দুস্থানী শাসনশাস্ত্রে। তাই শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল শেখ মুজিবের সাথে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রমনা ঘোড়দৌড় মাঠে ইন্দিরা-মঞ্চ নাম দিয়ে একটি তথাকথিত বিজয়তোড়ন বানিয়ে হিন্দুস্থানী বিজয়ের মহানায়িকা হিন্দুস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে এক সাড়ম্বরপূর্ণ অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সনের ১৯শে মার্চ হিন্দুস্থান এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য এক দাসত্বমূলক তথাকথিত মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির তাৎক্ষনিক ফল হিসাবে বাংলাদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী অপসারনের ব্যবস্থা করা হয় সত্যি কিন্তু এ চুক্তির শর্তসমূহ বাংলাদেশের জন্য ছিল অত্যন্ত অবমাননাকর ও অপমানজনক। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা বলে আর কিছুই বাকী রইল না।

www.pathagar.com

তের

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুনিয়ার বুকে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ইতিমধ্যে তা বত্রিশ বছর হয়ে গেলো। মোহময় যাদুর দেশ যে "সোনার বাংলার" স্বপ্ন দেখিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবর রহমান এ দেশের মানুষ হুজুগে বাঙালদের পাগল করে তুলেছিলেন এবং যে মধুময় "সোনার বাংলা" পাওয়া বা খাওয়ার জন্য একদিন এ দেশের অধিকাংশ মানুষ অস্থির হয়ে গিয়েছিল এতদিনে তা নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। তা হলে আসুন, এবার আমরা বড় সাধের এ "সোনার বাংলার" সত্যিকার রূপটা একটু প্রত্যক্ষ করি এবং আজকের এ "সোনার বাংলা" গড়ার কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের শাসনামলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন শাসক ও নেতাদের অবদান সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা-পর্যালোচনা করি।

বিগত বত্রিশ বছরে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় যাঁরা অধিষ্ঠিত ছিলেন বা বর্তমানে আছেন তাদের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, শেখ মজিবর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহম্মদ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার, লেঃ জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা। এঁদের ভিতর প্রথমোক্ত দু'জন ছিলেন সত্যিকার অর্থে যথাক্রমে সোনার বাংলার প্রবক্তা ও স্বপ্নদ্রষ্টা এবং তা বাস্তবায়নের পথে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক ও প্রধান সংগঠক।

এবার আসা যাক আসল আলোচনায়। পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এসেই শেখ মজিবর রহমান একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেশ শাসনের ভার তাঁর নিজের হাতে তুলে নেন। তথাকথিত বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের নামে তখন এ দেশের মানুষ (মুষ্ঠিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া) পাগল। শেখ মজিবের যে কোন কথায় বা কাজে এ দেশের মানুষের ছিল অন্ধসমর্থন। কেউ প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করলে তার বেঁচে থাকার উপায় ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য শেখ সাহেবের। শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই শেখ মুজিব এমন কতগুলো কাজ করলেন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যা দেশের মানুষকে হতবাক করে দিল এবং পর্বতপ্রমান তাঁর জনসমর্থন অতি অল্প সময়ের ভিতর নিয়ে পৌঁছে দিল শূন্যের কোঠায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, দেশে ফিরে শেখ মুজিব হিন্দুস্থানী বন্দনায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের পরিত্যক্ত হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, সোনাদানা ও যানবাহন সমেত অগণিত বেসামরিক যানবাহন, রেলগাড়ি, শিল্পকারখানার যন্ত্রাংশ এবং মালামাল ও সম্পদ যে হিন্দুস্থানী সৈন্যরা লুট করে নিয়ে গেল সে ব্যাপারে শেখ মুজিব একটি প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। বরং

www.pathagar.com

হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ঢাকা দাওয়াত দিয়ে এনে জাঁকজমকপূর্ণ শাহী অভ্যর্থনা প্রদানের পরে হিন্দুস্থানের সাথে তথাকথিত যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করলেন তা দেশের চিন্তাশীল মানুষদের মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার করে।

দেশের মানুষের কল্যানের জন্য কোন কিছু করার কথা ভুলে গিয়ে শেখ সাহেব, যে হিন্দুস্থান তাঁকে একটি দেশ জয় করে অনুগ্রহপূর্বক তার শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়ে দিয়েছে, সেই বিজাতীয় দেশটির স্বার্থ উদ্ধার এবং এ কাজে তাঁর সহযোগী শেখ সাহেবের নিজস্ব দল আওয়ামী লীগ দলীয় টাউট-বাটপারদের লুটপাটের সুযোগ করে দেয়ার জন্যই উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

হিন্দুস্থান কর্তৃক দেশটাকে অবাধ নিষ্ঠুর শোষনের সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সরকার হিন্দুস্থানের সাথে মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থার ঘোষণা দেন। এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ছ'মাইল এলাকাকে হিন্দুস্থানের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অবাধ বাণিজ্য এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এ ব্যবস্থায় হিন্দুস্থান সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের ছ'মাইল এলাকার ভিতর হিন্দুস্থান যে কোন পরিমান যে কোন বাংলাদেশী পন্য বা হিন্দুস্থানী মালামাল কেনা-বেচা করতে পারতো। এ অদ্ভূত ব্যবস্থার ফলে হিন্দুস্থান তার নিজস্ব পাটকলগুলোর জন্য বাংলাদেশে উৎপাদিত উৎকৃষ্টতর কাঁচা পাট যথেচ্ছ পরিমানে কেনার এবং বিদেশে এ উৎকৃষ্ট পাট এবং পাটজাত দ্রব্য তার নিজস্ব পণ্য হিসাবে চালান দিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানী বাজার দখল করে নেয়ার অবৈধ অবাধ সুবিধা লাভ করে। তা ছাড়া, হিন্দুস্থানের উৎপাদিত নিম্নমানের মালামাল এবং বিশেষ করে বস্ত্রসামগ্রী যা বিদেশে রপ্তানী করা যাচ্ছিল না তা অবাধে বাংলাদেশে পাচার করে দিয়ে এ দেশে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশী দামের বস্ত্রসামগ্রীকে এক অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিয়ে দেশের গোটা বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় এ ব্যবস্থা।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসেই তার দলীয় লোকদের পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন সমস্ত শিল্পকারখানা বাজেয়াপ্ত করার নামে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসে। এরপর, প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাধীন শিল্পকারখানা পরিচালনার নামে একজন করে তথাকথিত প্রশাসক তথা আওয়ামী লীগ দলীয় লুটেরা বসিয়ে দেয়। এ সব লুটেরাদের ইতিপূর্বে কোন শিল্পকারখানা ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, এ সমস্ত আওয়ামী লীগ দলীয় লোকজন সাধারনভাবে ছিল নিতান্তই অসৎ। তাই তারা ক্ষমতা ও সুযোগ পেয়ে কল-কারখানাগুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব লোকজন যত খুশি তত সংখ্যায় বসিয়ে দেয়। এর ফলে, বিভিন্ন লাভজনক মিল-কারখানাগুলি এদের অযোগ্য পরিচালনা ও নির্বিচার লুটপাটের ফলে অচিরেই এক একটি মারাত্মক লোকসানের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। দেশের গোটা শিল্পক্ষেত্র রাতারাতি দারুন সংকট ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। জাতি দ্রুত এক সর্বনাশের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু এর চেয়েও এক ভয়াবহ বিপর্যয় দ্রুত এগিয়ে আসে বাংলাদেশের শিল্প-জগৎকে গ্রাস করতে। এ বিপর্যয়ের মূলে ছিল বাংলাদেশের সমস্ত শিল্পকারখানা ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিন্দুস্থানী জঘন্য ষড়যন্ত্র। ১৯৭২ সনের গোড়া থেকেই দেশের বিভিন্ন শিল্পকারখানা এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের পাটকলগুলো এক রহস্যজনক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের শিকার হতে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাটকলগুলির গুদামে মজুদকৃত কাঁচা পাট এবং মিলে উৎপাদিত পাটসামগ্রী অব্যাহতভাবে একের পর এক আকস্মিক অগ্নিকান্ডের ফলে দেশবাসীর চোখের সামনে ভস্মীভূত হতে থাকে। হিন্দুস্থান কর্তৃক তার এ দেশীয় সেবাদাসদের দ্বারা পরিচালিত এ অগ্নিকান্ডের ফলে অল্পদিনের ভিতরই বাংলাদেশের পাটশিল্প এক ভয়াবহ সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়। বাংলাদেশের পাটশিল্পের সেই যে ধ্বংস আরম্ভ হয়, তা থেকে দেশ কোনদিনই আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। যে পাটশিল্পের মাধ্যমে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার ভাগাভাগির ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের ধুয়া তুলে শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ নেতারা এ দেশের মানুষকে সোনার বাংলার যাদুর চেরাগের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরে মাত্র সাড়ে তিন বছরের আওয়ামী লীগ শাসনামলেই প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ শাসন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং অদ্যাবধি বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন সরকার বা নেতা-নেত্রীই তা পুনরুদ্ধারের জন্য সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে সচেষ্ট হননি বা কোন পদক্ষেপ সঠিকভাবে গ্রহন করেননি। বরং বাংলাদেশ থেকে পাটশিল্পকে চিরতরে উচ্ছেদ করে তা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুস্থানের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এযাবৎকাল বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসা প্রায় প্রতিটি সরকারই তার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পাট আজ আর বাংলাদেশের গর্ব বা সম্পদ নয়। পাট আজ বাংলাদেশের অভিশাপ। পাট আজ বাংলাদেশের সমস্যা। কৃষকরা আজ আর পাট চাষ করতে উৎসাহী নয়। কারণ পাট চাষ করতে যে খরচ পড়ে, বিক্রি করে প্রতি মন পাটের সে দামও পায় না কৃষকরা। তাই দিন দিন পাট চাষের জমির পরিমান শুধু সংকুচিতই হচ্ছে। পাকিস্তান আমলে গোটা বিশ্বে উৎপাদিত পাটের প্রায় ষাট শতাংশ উৎপন্ন হতো পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে উৎপাদিত পাটের ত্রিশ শতাংশও বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় কিনা সন্দেহ। পাকিস্তান আমলের সোনালী আঁশ পাটের আজ বাংলাদেশে তিমিরাচ্ছন্ন দশা। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসা প্রতিটি সরকারই ক্ষমতায় বসেই একের পর এক শিল্পকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন। নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা নয়, পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত সে সময়কার প্রচুর লাভজনক প্রতিটি কল-কারখানা বন্ধ করে দেয়াই হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারের প্রধান কাজ। আসলে, এ কাজটি করার পেছনে বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের একটা যুক্তিও আছে। আর তা হচ্ছে,

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত এ সমস্ত শিল্পকারখানাগুলি তো ছিল পাকিস্তান আমলের তথাকথিত ঔপনিবেশিক শোষনের চিহ্ন বা নমুনা। সুতরাং, পাকিস্তান আমলের কোন কিছুই টিকিয়ে রাখা ঠিক নয়। অবশ্যি, ভাল কিছু করার বা টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা বা ইচ্ছাও তো থাকা চাই। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারসমূহের বা দলীয় নেতাদের ভিতর ক'জনের সে ক্ষমতা বা সদিচ্ছা ছিল বা আছে তা চিন্তা করার বিষয় বই কি!

বাংলাদেশের বত্রিশ বছরের শাসন আমল শেষে বর্তমানে দেশের শিল্পকারখানা তথা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যে সকরুন অবস্থা তা পর্যালোচনা করলে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির গা শিউরে না উঠে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অথবা আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যাঁরা দেশ শাসন করেছেন তাঁদের মনে দেশের এ করুন দশা কোন রেখাপাত করছে বলে তো মনে হয় না। ১৯৪৭ সনে যখন দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পকারখানা বলে তো কিছুই ছিল না। দেশে মাত্র চারটি বস্ত্রকল এবং দুইটি চিনি কারখানা ছিল আর প্রতিটিরই মালিক ছিলেন হিন্দু শিল্পপতিগণ। এদের ভিতর শুধু একটি চিনিকলের মালিক ছিলেন ইংরেজ। তারপরে, পাকিস্তান আমলের মাত্র তেইশ বছরে দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। তেইশ বছরের পাকিস্তানী শাসনামলে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৭৮টি পাটকল, ৭০টি বস্ত্রকারখানা, ১৪টি চিনিকলসহ অসংখ্য শিল্পকারখানা। আর এ উদ্দেশ্যে দেশে গড়ে তোলা হয়েছিল অনেক শিল্পনগরী। এ ছাড়াও, দেশে ভারী শিল্পকারখানা গড়ে তোলার ব্যবস্থাও চলছিল দ্রুত গতিতে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি করে সরকারী মালিকানাধীন ষ্টিলমিল, অয়েল রিফাইনারী, নিউজপ্রিন্ট মিল, অস্ত্রকারখানা, দুইটি সিমেন্ট কারখানা, দুইটি কাগজকল, কাপ্তাই পাণিবিদ্যুৎ প্রকল্পসহ ৪টি বিদ্যুৎ কারখানা এবং তিনটি সারকারখানাসহ বহু ভারী শিল্পকারখানা। এমনিভাবে দেশ যখন দ্রুত শিল্পায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনি পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আমলের তেইশ বছরের শাসনে দেশে শূন্য অবস্থা থেকে যেখানে অগণিত শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ দ্রুত উন্নয়নগামী জগতের একটি আদর্শ রাষ্ট্ররূপে বিশ্বের মানচিত্রে অবস্থান করে নিয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বত্রিশ বছর পরে নতুন কোন শিল্পকারখানা সাধারণভাবে গড়ে না উঠে পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ শাসকদের হাতে তিলে তিলে গড়া শিল্পকারখানাগুলিও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? ব্যাপারটা বিশেষভাবে চিন্তা করার মত বিষয় বটে। স্বাধীনতার নামে হিন্দুস্থানের হাতে দাবার ঘুঁটি হয়ে দেশটাকে এমন করে সর্বনাশের মাঝে ঠেলে দেয়া হলো কেন? কে জবাব দেবে আজ জাতিকে এ প্রশ্নের?

পাকিস্তানী কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসার অল্পদিনের ভিতরেই শেখ মজিবর রহমান তাঁর ঘনিষ্ঠ আপনজন এবং পরামর্শদাতাদের উপদেশক্রমে

www.pathagar.com

গোটা বাংলাদেশটাকেই একটি আওয়ামী লীগ দলীয় কয়েদখানা বানিয়ে ফেলেন। কেউ কোন ব্যাপারে শেখ মজিবর রহমান বা আওয়ামী লীগ দলীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের সামান্যতম বিরোধিতা করুক আওয়ামী লীগ সরকার তাও বরদাস্ত করতে একেবারেই রাজী ছিলেন না। আওয়ামী লীগ সরকার তথা শেখ মুজিবের কথা ছিল যেন বেদবাক্য এবং তাঁর কার্যকলাপ ছিল যেন গঙ্গার জলে ধোয়া তুলসী পাতা। এর সমালোচনা করা ছিল নিতান্তই গর্হিত কাজ, 'মহাপাপ'। কেউ সে কাজ করে বসলে জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাই ছিল একমাত্র পথ। স্বাধীন পাকিস্তান ভেঙ্গে ডাবল স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নব্য দেশটির ভিতরকার সত্যিকার অবস্থাটা ছিল এমনিই।

ক্ষমতার মসনদে বসেই শেখ মুজিব বুঝতে পারলেন, দেশের সমস্ত লোকই সমানভাবে তাঁর নির্দেশ মানতে রাজী নয়। কিছু লোক তাঁর কাজের আলোচনা-সমালোচনা করছে। এবার তিনি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে তাঁর এবং তাঁর দলের দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার পথে যারা বাধা তাদের চিরতরে নির্মূল করার জন্য তাঁর নিজস্ব দলীয় বাহিনী তথা "রক্ষিবাহিনী" গঠন করেন। জনশ্রুতি আছে, এই বাহিনীতে যেমন আওয়ামী লীগ দলীয় এ দেশীয় বিশ্বস্ত লোকজন ছিল, তেমনি আওয়ামী লীগের পরম মিত্র ও মুরুব্বী দেশ হিন্দুস্থানের লোকজনও ছিল যথেষ্ট সংখ্যায়। বিশেষ করে, রক্ষিবাহিনীর নীতি ও কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব নাকি ছিল সাধারণভাবে হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনীরই কর্মকর্তাদের হাতে। আওয়ামী লীগের এ দলীয় বাহিনী পরিচালনার সার্বিক রাজনৈতিক দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল তখনকার দিনে শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত তাঁরই রাজনৈতিক উপদেষ্টা তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও গণ-আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক চৌকস ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহম্মদের হাতে।

যা হোক, রক্ষিবাহিনী গঠন করার সাথে সাথে বাংলাদেশে শুরু হয় আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তি ও লোকজনদের নির্বিচার গণহত্যা। ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত হিন্দুস্থানী সৈন্যদের কাছে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পন পর্যন্ত এবং তারপরেও রক্ষিবাহিনী গঠনকাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তথাকথিত পাকিস্তানপন্থী নামে এ দেশের ইসলামপন্থী ও হিন্দুস্থান-বিরোধী লোকদের পাইকারীহারে খুন করার পরে আর দেশে তথাকথিত পাকিস্তানী দালাল বলে কাউকে বড় একটা খুঁজে পাচ্ছিল না রক্ষিবাহিনীর লোকজন। কারণ, এ ধরণের লোকদের পাইকারীহারে খুন করার পরেও যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তারা প্রায় সবাই তখন আশ্রয় পেয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন জেলখানায়। এ ছাড়া, কিছু লোক যারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আওয়ামী পান্ডারা তাদের হদিস খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই এদের খুন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আওয়ামী লীগ বিরোধী পাকিস্তানপন্থীরা তখন শেখ মুজিব বা তাঁর দলের জন্য তেমন কোন সমস্যার কারণ না হলেও আওয়ামী সরকারের জন্য মারাত্মক এক

www.pathagar.com

সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে সংগঠিত একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন। নবগঠিত এ দলটির সত্যিকার সংগঠক ও নেতা ছিলেন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং বিশিষ্ট ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান। এ দলটির সভাপতি করা হয়েছিল বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা খাঁটি দেশপ্রেমিক ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মেজর জলিলকে। এ দলটির নেতারা দেশের তরুণ ছাত্রসমাজ এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিরাট অংশকে দেশের মজলুম জনগোষ্ঠীর মুক্তির মোক্ষম দাওয়া হিসাবে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের ধুয়া তুলে সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এ দলটি আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য সত্যিই এক বিরাট মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদের কার্যক্রমও ছিল সত্যিই বেশ মারমুখী এবং জঙ্গী মনোভাবাপন্ন। এ দলের নেতারা শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের হিন্দুস্থানের দালাল বলে নোংরা ভাষায় গালাগালি করতে থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ দলটির সত্যিকার ক্ষমতা যাঁর বা যাঁদের হাতে ছিল তাঁরাও ছিল প্রকৃতপক্ষেই হিন্দুস্থানী স্বার্থেরই ক্রীড়নক। তবে এ ব্যাপারটি জনগনের কাছে পরিস্কার হতে বেশ সময় লাগে।

যা হোক, শেখ মুজিব এবং তাঁর আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার প্রধানতঃ জাসদকেই তাদের প্রধান শত্রু ও প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে রক্ষিবাহিনী ও অন্যান্য সহায়ক বাহিনীর সাহায্যে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। ফলে, অল্পদিনের ভিতরেই হাজার হাজার নিরপরাধ আদমসন্তান অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ছিল, রক্ষিবাহিনী যাদের হত্যা করে তাদের একটি বিরাট অংশই ছিল ১৯৭১ এর মুক্তিবাহিনীর লোক এবং তরুণ ছাত্র। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, দেশের জন্য শেখ মুজিবের কথায় যারা বিনা বাক্যব্যয়ে একদিন প্রাণ দিতে রাজী ছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদেরই অকারনে তাদের সেই প্রানাধিক প্রিয় নেতার আদেশে অকারণে মৃত্যু বরণ করতে হলো।

চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার পথে যাদেরই আওয়ামী সরকার তাদের পথের কাঁটা মনে করেছিল, নির্বিচার হত্যা ও গুম করার ব্যাপারে তাদের কাউকেই তারা রেহাই দেয়নি, হোক তারা আগের দিনে রাজনীতির ব্যাপারে যতই ঘনিষ্ঠ ও বন্ধু। এ ভাবে দেশে একটা নীরব গণহত্যা পরিচালিত হয় দীর্ঘদিন ধরে। আর এ গণহত্যার অন্যতম শিকার হলেন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সহায়ক বাহিনী সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ শিকদার। এই সিরাজ সিকদার নিহত হন শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নির্দেশে।

যেভাবে শেখ মুজিবের নির্দেশে অকালে ঝড়ে পড়েছিল এ দেশের অগণিত মানবসন্তান, সে ভাবেই ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট রাতের প্রথম প্রহরে ঘাতকের বুলেটের নির্মম আঘাতে এক ঐতিহাসিক বিপ্লবের ফলে শেখ মুজিবও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। এ বিপ্লবের ফলেই শেষ হয়ে যায় শেখ মুজিব ও তাঁর দলের

www.pathagar.com

সাড়ে তিন বছরের কিছু অধিক কালের নির্মম শাসন।

শেখ মুজিবের অকাল মৃত্যুর পরে মাত্র অল্প কয়েক দিনের জন্য ক্ষমতায় আসেন শেখ সাহেবেরই বহুদিনের রাজনৈতিক সহচর ও তাঁর মন্ত্রিসভারই অন্যতম সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ। কিন্তু ক্ষমতা সুসংহত করার আগেই তাঁকে অবাঞ্ছিতভাবে বিদায় নিতে হয়। এবার ক্ষমতার মঞ্চে আসেন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধেরই প্রধান সংগঠক এবং ঐতিহাসিক ঘোষক জেনারেল জিয়াউর রহমান। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তিনিও শেখ মুজিবের পথেই অগ্রসর হন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের ভিতর সাধারণভাবে যে অপরিহায্য গুনটির মারাত্মক অভাব, সেই দুর্লভ গুনটি ছিল তাঁর। জিয়াউর রহমান সর্বোপরি আর্থিক দিকের বিবেচনায় ছিলেন একেবারেই খাঁটি এবং সৎ। কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনিও তাঁর পথের কাঁটা সরাতে খুন করেছিলেন বহুলোক। আর এর ফলে, বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাংলাদেশের বিমান ও পদাতিক বাহিনী। ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে বেশ কয়েকবার জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এবং এর পরে প্রতিবারই প্রাণ দিতে হয়েছে সামরিক বাহিনীর অনেক লোককে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয় শেষ পর্যন্ত তার সহকর্মীদের দ্বারা সংগঠিত এক অভ্যুত্থানের ফলেই।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় আসেন লেঃ জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, যাঁকে সাধারনভাবে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর জন্য আসল দায়ী ব্যক্তি হিসাবে গন্য করা হয়। সে যাই হোক, এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে পাইকারীহারে হত্যা করার রাজনীতি মোটামুটি বন্ধ হয়েছে। তবে এ কাজটি এখন যে একেবারেই চলছে না তা নয়। তবে এর মাত্রা এবং ধরন আর আগের মত নেই।

বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রবক্তারা সবাই সোচ্চারভাবে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত প্রেসিডেন্ট শাসিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কড়া সমালোচনা করতেন এবং বলতেন যে, এটা আসলে কোন গণতন্ত্রই নয়। এ সমস্ত নেতারা বলে বেড়াতেন যে, আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা পরোক্ষ নির্বাচন-নির্ভর গণতন্ত্র ছিল গণতন্ত্রের নামে একটি ভাঁওতাবাজি মাত্র। এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, এক শত নব্বই বছর বৃটিশ শাসনে থেকে এ দেশের মানুষ এবং বিশেষ করে এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রায় সবাই সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রে আদর্শ কোন ব্যবস্থা হিসাবে একমাত্র বৃটিশ ব্যবস্থাকেই গ্রহনীয় আদর্শরূপে মনে করার মত একটি ভ্রান্ত ধারনার শিকার হন। আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র মানে যে শুধু বৃটিশ ধাঁচের গণতন্ত্রই একমাত্র পন্থা নয় এবং বাংলাদেশের মত একটি অর্ধশিক্ষিত অনুন্নত ও রাজনৈতিক পরিপক্কতার দিক থেকে অনেক পশ্চাদপদ দেশে বৃটিশ মডেলের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র তথা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার চেয়ে মোটামুটি আমেরিকার

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র ধাঁচের প্রেসিডেন্ট শাসিত পরোক্ষ নির্বাচনভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক বেশী উপযোগী সে কথাটা আজও এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে সচেষ্ট হননি। এটা আসলেই বড় দুর্ভাগ্যজনক।

ক্ষমতার শীর্ষ আসনে আসীন হয়ে শেখ মুজিব তাঁর ক্ষমতার ভিত আরও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদেরই দল কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন করে পার্লামেন্ট পদ্ধতীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে একনায়কতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট পদ্ধতীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, শাসনতন্ত্র সংশোধন করে আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য কয়েকটি মৌলিক ব্যবস্থা বাংলাদেশ থেকে বিদায় করে দেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এ সংশোধনের মাধ্যমে শেখ মুজিব গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত বহুদলীয় ব্যবস্থা বিলোপ করে বাংলাদেশে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে তাঁর নিজস্ব একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশের বাদবাকী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি বন্ধ করে দেন। ইতিপূর্বে একটি কথা উল্লেখ করা হয়নি। ক্ষমতায় বসেই আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে বা কাজ করেছে এমন ছয়টি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এ সমস্ত দলের সকল ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এ সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম বা সবুর), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি এবং জামায়াত-ই-ইসলামী। এ সমস্ত পাকিস্তানপন্থী বা ইসলাম-পছন্দ দলগুলিকে যখন বন্ধ ঘোষণা করা হয় তখন ইসলাম-বিরোধী এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি বেশ আনন্দের সাথে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের এ পদক্ষেপকে জোরালো সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু অন্যায়কারীকে সমর্থন করলে যে একদিন নিজের বা নিজেদেরও অন্যায় এবং অত্যাচারের সম্মুখীন হত হয়, এ ধ্রুব সত্যটি এতদিনে এ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি হাড়ে হাড়ে টের পেল। পাকিস্তান থেকে বেড়িয়ে এসে প্রথম দিকেই আওয়ামী লীগ সরকার পাকিস্তানপন্থী বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্বের নাগরিকত্ব হরন করে নেয় এবং এঁদের ভিতরে যাঁরা বিদেশে ছিলেন তাঁদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ ছাড়া, পাকিস্তানপন্থী অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সমর্থকের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক জারিকৃত তথাকথিত বিভিন্ন অপরাধ দমনমূলক আইনের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত বিচারাদালতের মাধ্যমে প্রহসনমূলক বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। এবার বাকশালের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিবে তাদের বিরুদ্ধেও দ্রুত বিচার ও কঠিন সাজার বিধান রাখা হয়। তা ছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং প্রশাসনিক পদস্থ কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলকভাবে জোর করে বাকশালে যোগদান করার আয়োজন করা হয়।

www.pathagar.com

একই সাথে আওয়ামী সরকার দেশে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি থেকে মাত্র চারটি তাদের নিজস্ব দলীয় নিয়ন্ত্রনে রেখে বাদবাকী সমস্ত সংবাদপত্র সরাসরি বন্ধ করে দেন। এ ছাড়া, সভাসমিতি এবং মত প্রকাশের সমস্ত মাধ্যমের উপরও কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি করেন। এভাবেই শেখ মুজিব তাঁর দল কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র আমূল পরিবর্তন করে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থার নামে দেশের সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে মাত্র চারটি সংবাদপত্র তাদের দলের নিয়ন্ত্রনে রেখে একদলীয় বাকশালের শাসন কায়েম করে বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে নিজের হাতে একজন স্বৈরশাসক হিসেবে দেশের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেন। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান প্রবর্তিত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাসম্বলিত গণতন্ত্রের বদলে দেশবাসীর জন্য এ এক মহান ও অভিনব বাঙালী-মার্কা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বটে!

শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ দলীয় বিভিন্ন নেতা-কর্মী এবং সর্বোপরি শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন তথা তাঁর ছেলে শেখ কামাল ও ভাগ্নে শেখ মনিদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, অত্যাচার আর বাড়াবাড়ির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মাত্র তিন বছর আট মাস পাঁচ দিনের মাথায় এ জঘন্য স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে তাদেরই শিষ্য ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা সামরিক বাহিনীর কতিপয় তরুণ অফিসার কর্তৃক পরিচালিত এক ঐতিহাসিক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট রাতের প্রথম প্রহরে। শেখ মুজিব তাঁর পরিবার-পরিজনসহ নিহত হন এ অভ্যুত্থানে। তাঁর দু'মেয়ে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে শেখ মুজিবের ডাকে একদিন এ দেশের গণ-মানুষ (সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) আগ-পাছ কিছু বাচবিচার না করে নিরস্ত্র অবস্থায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং অকাতরে প্রাণ দিতে রাজী ছিল, সেই শেখ মুজিব যখন নিহত হলেন তখন তাঁর জন্য এ দেশের একজন মানুষও ইন্না লিল্লাহ্ পড়েছে বা তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছে বলে শুনা যায়নি। বরং, শেখ মুজিবের বহুদিনের রাজনৈতিক সাথী এবং তাঁর মন্ত্রিসভারই অন্যতম সদস্য আব্দুল মালেক উকিল শেখ সাহেবের মৃত্যুর পরে যখন লন্ডন যান তখন সেখানে মন্তব্য করেন যে, দেশ ফেরাউনের (শেখ মজিবর রহমান) হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। হায়রে বাঙালী জাতি! কি বিচিত্র এদের চরিত্র আর মানসিকতা!

শেখ মুজিবের শাসনামলে ১৯৭৩ সনে দেশে একবার সংসদ নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে শেখ মুজিবদের বিরুদ্ধে তেমন কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল না। তবে মেজর জলিলের মত সত্যিকার একজন দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে গঠিত এবং আ.স.ম. রবের মত একজন চতুর প্রাক্তন ছাত্রনেতার দ্বারা পরিচালিত মাত্র কয়েক মাস আগে সংগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল আওয়ামী লীগের জন্য সত্যিই কিছুটা

www.pathagar.com

মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ দলটির নেতা ও কর্মীরা ছিল বেশ বেপরোয়া ও জঙ্গীভাবাপন্ন। আর তা ছাড়া, এ দলের মূল নেতা আ.স.ম. রব এ দলের মাধ্যমে দেশবাসীকে তাঁর অভিনব আবিস্কার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র উপহার দেওয়ার কথা বলে তরুণ সমাজকে অনেকটা মাতিয়ে তুলেছিলেন। সোনার বাংলা তো ইতিমধ্যে অনেকটাই দেখে ফেলেছিল দেশবাসী। এবার আরেকটি মহানেয়ামত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্বাদও একবার গ্রহন করতে অসুবিধা কোথায়?

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন বেশ ভালভাবেই হল। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দুনিয়ার সামনে তার নিজস্ব আদর্শ গণতান্ত্রিক মডেল উপস্থাপন করে, যে নির্বাচনে ভোটারদের কষ্ট করে ভোট-কেন্দ্রে আসার প্রয়োজন হয় না। আর যদি কেউ অকারণে আহাম্মকের মত এসেও যায়, তা হলেও কষ্ট করে তার ভোট দেয়ার দরকার পরে না। কারন, ভোট-কেন্দ্রে বিভিন্ন ভোটপ্রার্থীর ভিতর যিনি অনেক বেশী শক্তিশালী বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ,তার পক্ষে যারা সশস্ত্র কর্মী বা ক্যাডার আছে তারাই, দয়া করে নির্বাচন-কেন্দ্রে কার্যরত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যালট-পেপারগুলো নিয়ে যথারীতি সীল মেরে ব্যালট-বাক্সে ফেলে দিবেন। ভোট-কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা ও লোকজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে শুধু ভোট-বাক্সে ভর্তি ব্যালট-পেপারগুলো গুনে ফলাফল তৈরী করে যথারীতি তা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যথাযথ কর্মকর্তার কাছে যথানিয়ম পাঠিয়ে দেওয়া। এ কাজে ভোটার বা নির্বাচন-কেন্দ্রে দায়িত্বরত যে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে, দরকারবোধে, তাকে শায়েস্তা করা বা ব্যালট-বাক্সগুলি পুড়িয়ে ফেলা বা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হবে। আর এতসবের পরেও যদি প্রয়োজন হয় তা হলে সরকারী দলের পক্ষে নির্বাচন কমিশন চাপের মুখে জানের ভয়ে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ফলাফল হিসাবে সরকারের পছন্দমাফিক প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে দিবেন। শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এমন একটি সহজ, সুন্দর ও আদর্শ মডেলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে, মাত্র সাতটি আসন বাদে বাদবাকী সব আসনে আওয়ামী প্রার্থীরা বিপুল ভোটে বিজয়ী বলে ঘোষিত হন।

শেখ মুজিব কর্তৃক প্রবর্তিত এ আদর্শ নির্বাচনী ব্যবস্থা আজ পর্যন্তও কমবেশী বাংলাদেশে প্রচলিত ও সক্রিয় আছে। মাঝখানে কয়েক বছর যখন জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় ছিলেন তখন এর কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছিল মাত্র। জেনারেল জিয়ার সময়কার নির্বাচনে সাধারণভাবে ব্যালট-বাক্স ছিনতাইয়ের মহড়া চলেনি। তবে কোন দলের কোন প্রার্থী কোথায় বিজয়ী হবে বা নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল মোট কতটি আসন পাবে তা মোটামুটিভাবে আগেই নির্ধারিত থাকতো। এ ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ভিতর নির্বাচনী মহড়ার পূর্বেই একটা সমঝোতা হতো এবং সে অনুসারে একটি নীলনক্সা তৈরী হতো। নির্বাচনের নামে ওই নীলনক্সাটাই সাধারণতঃ

www.pathagar.com

বাস্তবায়িত হতো।

তবে নির্বাচনে বাংলাদেশী মডেল বাস্তবায়নে নিঃসন্দেহে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশে যতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে সাধারণতঃ ভোটরদের কষ্ট করে ভোট-কেন্দ্রে আসতে হয়নি, অথবা আসলেও ভোট দিতে হয়নি। কারণ, ভোট যাদের দেয়ার দায়িত্ব তারাই সীল দিয়ে ব্যালট-পেপার ভোট-বাক্সে ফেলে দিতেন অথবা ভোট যা পড়েছে তা ইচ্ছেমতো রদবদল করে নির্বাচনে ভোটের ফলাফল তালিকা তৈরী করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সবশেষে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার সময় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফলের তোয়াক্কা না করে যাকে যেখানে খুশি সরকারী ইচ্ছামাফিক নির্বাচনে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হতো। তবে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ভদ্রলোক ছিলেন বলেই তার সময় ব্যালট-বাক্স ছিনতাই বা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারটা বেশ কম ছিল তার গুরু শেখ মুজিবের জামানার চেয়ে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কোন সাধারণ নির্বাচনই শতকরা একশত ভাগ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি। তবে এ যাবৎকাল অনুষ্ঠিত সমস্ত নির্বাচনের ভিতর, বোধ হয়, সবচেয়ে ভাল সাধারণ নির্বাচন হয়েছে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনটি। গণতন্ত্র আজ বাংলাদেশে একটি মাকাল ফল মাত্র। কথায় বলে না, মোল্লার গরু গোয়ালে নেই, হিসাবের খাতায় আছে। গণতন্ত্রও তেমনি আজ বাংলাদেশে কোথাও বাস্তবে নেই, রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা এবং কথার ফুলঝুড়িতে আছে মাত্র। বাংলাদেশে আজকে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে গণতন্ত্র এ দেশে সুদূরপরাহত। এ দেশে কোন সাধারণ নির্বাচনে কোন সৎ ও ভাল লোক প্রার্থী হয়ে ভোটযুদ্ধে জয়ী হয়ে আসা অসম্ভব। বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জয়ী হতে হলে প্রচুর টাকা দরকার। নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্য বাংলাদেশে আজ প্রধান ও মুখ্য দু'টি উপাদান (factor) হচ্ছে টাকা এবং অস্ত্র। এ দু'টি জিনিষ ছাড়া নির্বাচনে কোন ফেরেস্তা দাঁড়ালেও তার নির্বাচিত হবার কোনই আশা নেই। দেশে সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন কায়েম করতে হলে বিরাজমান নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা একান্ত দরকার। তা না হলে এ দেশে টাউট-বাটপারদেরই রাজত্ব চলবে অব্যাহতভাবে। ১৯৯১ সন থেকে বাংলাদেশে চালু তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা দেশে গণতন্ত্র বিকাশের পথে আরেকটি অবাঞ্ছিত বাধা ও অন্তরায়। এ ব্যবস্থাটি গণতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসেরই নামান্তর মাত্র।

চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, ছিনতাই, রাহাজানি ও হত্যা আজ বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সন্ত্রাস ও অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি অস্থির করে তুলেছে সমাজ জীবনকে। দেশে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই একেবারেই। ঘরে-বাইরে কেউ জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে মোটেই শঙ্কামুক্ত নয়। দয়ামায়া, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও

www.pathagar.com

সহমর্মিতার মত মানবিক গুনগুলি যেন সহসা বাংলাদেশ থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। কথায় কথায় মানুষ একজন আরেকজনকে খুন করছে। একটা বিড়াল-কুকুর মারা যাচ্ছে দেখলে হয়তো কেউ একটু আক্ষেপ করে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে বহু লোকের চোখের সামনেও যদি একজন নিরপরাধ মানুষকে কোন সন্ত্রাসী খুন করে তা হলে এ দেশে আজ কোন মানুষ এগিয়ে আসবে না সাহায্যে। বরং যে যেমন করে পারে নিজের প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে দ্রুত পালিয়ে যাবে সেখান থেকে। বাংলাদেশে দিন দিন সব জিনিষের দাম বাড়ছে হু হু করে কিন্তু মানুষের জীবনের দাম কমছে প্রতিদিন এর সাথে পাল্লা দিয়ে। এসবের জন্য দায়ী হচ্ছে সমাজে বিরাজমান চরম অস্থিরতা এবং অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়ি। সমাজে চলছে আজ সন্ত্রাসীদের সীমাহীন দৌরাত্ম্য এবং দাপট। মনে হচ্ছে, সন্ত্রাসীরাই যেন শাসন করছে দেশটাকে। সন্ত্রাসের এ ব্যাপক বিস্তারের মূলে রয়েছে দেশে এর ব্যাপক লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতারাই হচ্ছেন সন্ত্রাসীদের আসল মদদদাতা ও আশ্রয়দানকারী গডফাদার। সন্ত্রাসীরাই হচ্ছে দেশে রাজনৈতিক নেতাদের আসল শক্তি, কামাইয়ের মাধ্যম এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার। অবস্থার ধারাবাহিকতায় দেশের প্রশাসনিক অবকাঠামোর একটি বিরাট অংশও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে আজ এদের সাথে। শক্তহাতে এ বিপর্যয়ের মোকাবিলা না করলে জাতির জন্য সামনে মহাবিপদ। অবশ্যি, কোন সরকার সত্যিকারভাবে চাইলেও বাংলাদেশ থেকে রাতারাতি সন্ত্রাস নির্মূল করা কঠিন। কারণ, সন্ত্রাসীরা যে অস্ত্র ও রসদ ব্যবহার করছে তা এ দেশে খুব কমই তৈরী হয়। এর একটি বিরাট অংশ এবং বলতে গেলে, প্রায় সবটাই আসে বাংলাদেশের পরমমিত্র বন্ধুদেশ (?) প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিন্দুস্থান থেকে। হিন্দুস্থান চায় না বাংলাদেশে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করুক। ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার জন্য হিন্দুস্থানের চাই বাংলাদেশে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। তা হলেই না হিন্দুস্থান একদিন তার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ও নীলনক্সা বাস্তবায়িত করতে পারবে।

নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক দুর্নীতি হচ্ছে আজ বাংলাদেশের আরেকটি মারাত্মক সমস্যা। দুর্নীতি আজ গোটা দেশটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বাংলাদেশে এ যেন আরেক নীরব ঘাতক-ব্যাধি, এইড্‌স। সমাজের কোন ক্ষেত্র আজ আর বাকী নেই যেখানে এর সফল ও সরব পদচারনা নেই। দেশের আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগ সবই আজ ঘুনে ধরেছে। সামাজিক অবক্ষয়ে গোটা জাতি আজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তবে সবচেয়ে বড় ভীতির ব্যাপার হচ্ছে, যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়ানো হবে, বাংলাদেশে সেই সরষেই ভূতে ধরেছে। এ দেশে যারা রাজনীতি করেন, যারা এ দেশ পরিচালনা করেন, তাদের ভিতরই দুর্নীতি ঘাঁটি গেড়ে বসেছে শক্তভাবে। এ দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রীদের মধ্যে খুব কমই আছেন যাঁরা আজ এই মারাত্মক সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্ত। এ দেশের রাজনীতিবিদরা

www.pathagar.com

সাধারণভাবে এখন রাজনীতি করেন নিজেদের জন্য, দেশের তথা জনগণের মঙ্গল বা কল্যান সাধনের নিমিত্তে নয়। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, এ দেশের রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করেন নিজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। রাজনীতি এ দেশে আজ একটি লাভজনক পেশা। রাতারাতি বিনা মূলধনে প্রচুর অর্থবিত্ত কামাইয়ের বেশ ভাল উপায় হচ্ছে রাজনীতি করা এবং সময় ও সুযোগ মতো দেশের তথাকথিত একটি জনপ্রিয় দলে জায়গা করে নেয়া। বৃটিশ আমলে বা পাকিস্তানী জামানায় সাধারণতঃ সমাজের বিত্তবান এবং স্বচ্ছল লোকেরাই রাজনীতি করতেন। তখন রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্য ছিল সব কিছুর বিনিময়ে দেশের মানুষের উন্নতি ও কল্যান সাধন। তখন দেশের রাজনীতিবিদরা সাধারণভাবে রাজনীতিতে ঢুকতেন বেশ স্বচ্ছল অবস্থাতে আর রাজনীতি শেষ করতেন বেশ অস্বচ্ছল অবস্থার মাঝে। আর এখন বাংলাদেশে এ অবস্থার হয়েছে আমূল পরিবর্তন। এখন যারা রাজনীতি করেন তারা, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন সাধারণতঃ নিঃস্ব অবস্থায় আর রাজনীতি শেষে পরিণত হন কোটি কোটি টাকা, গাড়ী, বাড়ী এবং অগাধ সম্পত্তির মালিক। দেশে রাজনৈতিক ধারায় এ আমূল পরিবর্তনের ফলে জাতি বা জনগনের ভাগ্যের যা হবার তাই হচ্ছে। দেশ দিন দিন শুধু রসাতলেই যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, এ দেশে আজ মন্ত্রিত্ব বেচাকেনা হচ্ছে। মন্ত্রিত্ব ভাগাভাগির সময় নেতাদের আদর্শ ও গুনাগুন বিচারের চেয়ে প্রচুর টাকা আদান-প্রদানই মুখ্য বিষয় আজ। এ ছাড়া, সংসদ নির্বাচনের সময় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের কোন একটির 'নমিনেশন' পেতে হলে চাঁদার নামে দলকে এবং গোপনে দলের কোন কোন প্রভাবশালী নেতা বা নেত্রীকে দিতে হয় প্রচুর উৎকোচ। এই অভিনব চাঁদা ব্যবস্থার মাধ্যমেই আজ এ দেশে সম্ভব হচ্ছে, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 'নমিনেশন' না পেয়ে তাঁর আজীবনের রাজনৈতিক দল ছেড়ে রাতারাতি কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের অন্য একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রার্থী হচ্ছেন অবলীলাক্রমে। ব্যাপারটা দেশের সুস্থ রাজনীতির জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি আজ শক্ত করে ঘাঁটি গেড়ে বসেনি। নির্বাহী বিভাগের সর্বস্তরে দুর্নীতি আজ মারাত্মকভাবে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। সরকারী চাকরী করেন অথচো ঘুষ খান না, বাংলাদেশে এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নেই। এ দেশে সরকারী চাকরী এখন বিনা মূলধনে ভাল ব্যবসা। দেশের শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশও আজ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক ভীতিজনক অবস্থা হচ্ছে, বর্তমানে বাংলাদেশের বিচার বিভাগেও দুর্নীতি ভালভাবেই ঢুকে পড়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধেও আজ প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে এবং দুর্নীতির অভিযোগে বিচারকদের পদত্যাগের মত অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে।

www.pathagar.com

এটি জাতির জন্য মারাত্মক সর্বনাশা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে।

এ ছাড়া, আরেকটি ব্যাপারও দেশের রাজনীতিকে দিন দিন করছে কলুষিত। রাজনৈতিক দলের নেতারা ব্যবসা করবেন এটা কাম্য নয়। কারণ, রাজনীতির ধর্ম হচ্ছে, জনকল্যানের জন্য রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীরা অকাতরে সব কিছু বিলিয়ে দিবেন। বৈষয়িক বা আর্থিক কোন কিছু লাভ বা পাওয়ার আশা কোন সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্য বা আদর্শ হতে পারে না। অন্য দিকে, যারা ব্যবসা করেন তাদের সাধারণভাবে মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আর্থিক বা বস্তুগত দিক থেকে যত দ্রুত সম্ভব যে কোন উপায়ে মাত্রাহীনভাবে লাভবান হওয়া। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত লাভের চিন্তায় দেশের স্বার্থের কথাও ভুলে যান। এ দু'য়ের ধর্ম ও কর্ম সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তাই দেশের কোন মুখ্য রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী বা মুখ্য ব্যক্তিত্ব ব্যবসায় জড়িয়ে পড়লে অতি অল্প সময়ে অতি বেশী লাভের জন্যে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরাটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষ জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ দেখে আজ হতাশ। তারা এ দলটির কাছ থেকে বিশেষ কিছু পাবে বলে আজ আর আশা করে না। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তথা বিএনপি এর কাছে তো তাদের অনেক আশা ছিল। তাই এ দলটির যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তো এ দেশের মানুষ আজীবন দিয়েছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। জেনারেল জিয়া আজ নেই। কিন্তু জেনারেল জিয়া বা তাঁর দলকে তো এ দেশের মানুষ আজও ভালবাসে। এর কারণ কি? জেনারেল জিয়া ফেরেস্তা ছিলেন না। মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁরও বহু দোষ-ত্রুটি ছিল। কিন্তু এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি দুর্লভ গুন ছিল তাঁর। আর তা হলো, জেনারেল জিয়া সর্বোপরি সৎ নেতা ছিলেন। তাঁর পরিবার বা উত্তরসুরীরা জেনারেল জিয়ার সেই গর্বিত পথই অনুসরণ করবেন এটাই এ দেশের আপামর জনগণ আশা করে। কিন্তু যখন শেখ হাসিনা বা কোন আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, মৃত্যুর পরে জেনারেল জিয়ার ভাঙ্গা সুটকেচ এবং ছেঁড়া প্যান্ট-শার্ট দেখিয়ে বলা হল যে, সততা আর দেশ-সেবার জন্য তিনি কিছুই রেখে যেতে পারেননি তাঁর পরিবারের জন্য, তা হলে এত অল্প সময়ের ভিতর এত বেশী টাকার মালিক আজ কিভাবে হলেন তাঁর সন্তানগণ, তা হলে কি করে আজ হাজার হাজার কোটি টাকা তাঁর সন্তানরা বিনিয়োগ করছে দেশে-বিদেশে; তখন এ কথার কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না এ দেশের মানুষ। বিষয়টি জেনারেল জিয়ার উত্তরসুরীদেরও একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার বলে মনে হয়।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশ এবং জনকল্যানের পথে আরেকটি বাধা বড় অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ভিতরেই সত্যিকার অর্থে কোন গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সত্যিকার নেতা ছিলেন শেখ মজিবর রহমান। আর বিএনপির

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। দু'জন নেতারই ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ছিল অনন্য ভূমিকা। দেশের মানুষ এঁদের দু'জনকেই যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু জাতির জন্য দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশের মানুষ এ দু'জন নেতার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে একজনের সমর্থকরা সাধারণভাবে অন্যজনকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। সত্যিকথা বলতে গেলে, একজনের গুণগ্রাহী এবং সমর্থকরা অন্যজনকে অনেকটা ঘৃনাই করে। এ অবস্থায় এ দল দু'টির নেতা-নেত্রী নির্বাচন করার সময় উভয় দলের সমর্থক নেতা-কর্মী সবাই চান যে, দল দু'টির নেতৃত্বে থাকুক স্ব স্ব দলের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারেরই কেউ না কেউ। এ দল দু'টির নেতৃত্বের প্রশ্নে অন্য কোন যোগ্যতা বা গুণাগুন অদ্যাবধি কোনদিনও বিবেচিত হয়নি বা ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হচ্ছে না। এ বিশেষ কারনেই আজ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির নেতৃত্বে আছেন ওই দু'পরিবারেরই বয়োজেষ্ঠ দুই সদস্যা দুই মহিলা, যথাক্রমে শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া। দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলে তাই নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়ে আছে। এটা দেশে গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য অবশ্যই সহায়ক নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও ব্যাপারটা অনুকূল নয়। কারণ, পরিবার কেন্দ্রিক এ দল দু'টির ভেতর সম্পর্ক একেবারেই সাপে-নেউলে ভাব। তাই যখনই নির্বাচন-শেষে এক দল বদল হয়ে অন্য দল ক্ষমতায় আসে তখন প্রায়শঃই উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না বা রাখে না। অকারনে পূর্বেকার কার্যক্রমের দোষ-ত্রুটি বের করে তা বাদ নিয়ে নতুন কার্যক্রম গ্রহন করে নতুন সরকার। এর ফলে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয় মারাত্মকভাবে ব্যাহত। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এ দল দু'টি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরেও ওই যুদ্ধে কা'দের কতখানি অবদান ছিল তা জনসমক্ষে জাহির করার জন্য এবং তা চিরভাস্বর করে রাখার জন্য ক্ষমতা পেয়েই নিত্য নতুন পারিবারিক সম্পর্ক বিজড়িত স্মৃতিসৌধ বানিয়ে চল্‌ছে একের পর এক। আর এতে করে ব্যয় হচ্ছে শত শত কোটি টাকা। অথচো, দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য দেশে নিত্য নতুন কর্মসংস্থান বা কল-কারখানা স্থাপনের দিকে তেমন খেয়াল নেই এদের। এ দল দু'টি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণের মত ব্যাপারেও জাতীয়ভাবে চিন্তা করে একমত হয়ে কাজ করতে পারছে না। এটা নিশ্চয়ই কাঙ্খিত নয়।

বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত ক্ষতি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে তার শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া। হিন্দুস্থান তার এ দেশীয় এজেন্ট এবং সেবাদাস-দাসীদের মাধ্যমে এতদিনে বাংলাদেশে এ কাজটি বেশ সফলভাবেই সুসম্পন্ন করতে পেরেছে। পাকিস্তানী জামানায় জাতি তার

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে গর্ব করতো। তখনকার দিনে পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তান, যা আজকের বাংলাদেশ, তার শিক্ষার উন্নতমানের জন্য বিশ্বের দরবারে ছিলো বিশেষভাবে সমাদৃত। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে অভিহিত করা হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টা ও অবদান ছিল অপরিসীম। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঢাকাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তীব্র বাধা এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও নানা ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অতি শীঘ্রই এত উন্নত হয় যে, অচিরেই দুনিয়ার বুকে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হতে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে সেখানে কোন প্রকার ভর্তি-পরীক্ষা দেওয়ার দরকার হতো না। কিন্তু ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাধারণতঃ কোন ছাত্র-ছাত্রী সার্টিফিকেট নিয়ে বিশ্বের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি-পরীক্ষা দেওয়ারও সুযোগ পেতো না। বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা তো একেবারেই উঠে না। শিক্ষার ব্যাপারে বাংলাদেশের এ অধঃপতনের কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতই শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যাপক অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস। ছাত্র-রাজনীতির নামে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত। দেশের প্রায় সকল বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলিই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং ক্ষমতালাভের হাতিয়ার হিসাবে নিজ নিজ দলের লাঠিয়ালরূপে দলের অঙ্গসংগঠনের নামে লালন-পালন করছে একটি করে ছাত্রদল। এর জন্য এ সমস্ত রাজনৈতিক দলসমূহ দেশের তরুণ সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ। আর অস্ত্র হাতে পেয়ে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্খার প্রতীক তরুণ সমাজ সব কিছু ভুলে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুররূপে একে অন্যের বিরুদ্ধে হানাহানি ও রক্তারক্তিতে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে, দেশের শিক্ষাঙ্গনে নেমে এসেছে অবাঞ্ছিত অস্থিরতা। মারামারি, হানাহানি আর ছাত্র-ধর্মঘটের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বছরের বেশ কিছু দিনই বন্ধ থাকছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত। এর ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে সেসন-জট লেগে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দেশের প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটি শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে পড়েছে দু' থেকে চার বছর পর্যন্ত। দেশের তরুণদের জীবন থেকে অকারনে হারিয়ে যাচ্ছে তিন-চারটি বছর। বর্তমানে এতদিনে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও এর হাত থেকে জাতি এখনও মুক্ত হতে পারেনি সম্পূর্ণভাবে। আজকের বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে আরেকটি মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে, পরীক্ষার সময় নকল-চর্চা বা ব্যাপক গণ-ঠোকাঠুকি। ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ আজকাল আর বড় একটা লেখাপড়া করতে চায় না। বরং তার চেয়ে পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে গিয়ে বই দেখে প্রকাশ্যে বই থেকে গণ-

www.pathagar.com

ঠোকাঠুকিতেই বেশী উৎসাহী। এ অবাঞ্ছিত অবস্থাটির সূত্রপাত হয়েছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২ সনে যে পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সময় থেকে। তখনকার দিনে ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে বাধা দেয় এ সাধ্য কার! ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধারা তো দেশের আইন-কানুন, বিচার-ব্যবস্থা সব কিছুর উর্ধে। সে সময় থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের দেখাদেখি দেশের সমস্ত পরীক্ষার্থীরা যে মারাত্মক পথে পা বাড়িয়েছে তা আজ জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সরকার এবং বিশেষ করে বর্তমান বিএনপি দলীয় সরকার এ ব্যাপারে ব্যাপক চেষ্টা করেও এ সর্বনাশের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করতে পারছেন না। এটা চিন্তা করলে গা শিউরে উঠে যে, দেশের প্রতিটি পরীক্ষার সময় প্রায় প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রতিটি হল থেকে বস্তায় বস্তায় নকল-সামগ্রী তথা বই বা বইয়ের কাটা-পৃষ্ঠা উদ্ধার করা হচ্ছে এবং প্রতিটি পরীক্ষার সময় বহিস্কৃত হচ্ছে হাজার হাজার স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পরীক্ষাসমূহে এ ব্যাপক নকলবাজির বিরুদ্ধে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে কতিপয় শিক্ষককেও।

শিক্ষাক্ষেত্রে নকলবাজি থেকে মুক্ত হওয়ার পথে বেশ কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে। আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাঁরা শিক্ষক, ইতিমধ্যে তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও পরীক্ষাসমূহে পাশ করে এসেছেন এ অনৈতিক ও গর্হিত পথে। তাই তারা শিক্ষার্থীদের যথাযথ মানসম্মত শিক্ষা প্রদানেও হচ্ছেন অসমর্থ। ফলে, শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অকারণ সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় নিজেরাও নকল সরবরাহ করার মত গর্হিত কাজে ব্যাপৃত হচ্ছেন বা নকল সরবরাহকারীদের সাহায্য করছেন। তা ছাড়া, যথাযথ শিক্ষা না পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরাও বাধ্য হচ্ছে এ অশুভ পথে পা বাড়াতে। বর্তমানে বাংলাদেশের সীমিত কয়েকটি শহরের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোথাও সত্যিকার অর্থে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান বা গ্রহনের কোন সুযোগ ও ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে এ করুণ ও বিপজ্জনক অবস্থার আরেকটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ এখন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করছেন। এর ফলে, তাদের ভিতর সংকীর্ণ দলীয় চিন্তাধারা সংক্রমিত হচ্ছে। শিক্ষকরা এখন অনেকেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দলাদলিতে বেশী ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই একটি 'আদর্শস্থান' দখল করে আছেন। শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সাধারণতঃ আজকাল নিয়োগ দেয়া হয় সংকীর্ণ দলীয় বিবেচনায়, গুণগত মান বা যোগ্যতার

www.pathagar.com

বিচারে নয়। দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আজ অস্ত্রবাজি আর সন্ত্রাসের আড্ডাখানা। একদিনকার প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা তার কাছ দিয়ে চলাফেরা করতে মানুষ আজ ভয় পায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এ ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করতে না পারলে জাতির সর্বনাশ অনিবার্য।

চাঁদ-তারা খচিত সবুজ পাকিস্তানী নিশানের পরিবর্তে সবুজের মাঝে লাল সূর্য অঙ্কিত বাংলাদেশী পতাকা বদল হয়ে আসার সাথে সাথে বাংলাদেশে ইসলাম অনেকটা অসহায় অবস্থায় পড়েছে। বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দেয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। আর সেই পাকিস্তান ভেঙ্গে তার পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সনে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে তথাকথিত অর্থনৈতিক বৈষম্যের ধুয়া তুলে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী অনেক নেতাই বলে বেড়াতেন এবং এখনও কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন যে, বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্ব খতম করে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শ বিরোধী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভর করে। এরা মনে করেন যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে এ দেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের আর কোন অস্তিত্ব নেই। এদের এ ধারনা এবং প্রচারণা আসলে একেবারেই ভ্রান্ত ও অবাস্তব। কারণ, ১৯৭০ সনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারন নির্বাচনে এ দেশের মানুষ শেখ মুজিব এবং তাঁর দলকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে আলাদা একটি রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য নয়। এ দেশের গণ-মানুষ শেখ মুজিবদের ভোট দিয়েছিল আওয়ামী লীগ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচারিত শেখ মজিবর রহমানের সোনার বাংলা উপভোগ করার জন্য, নতুন কোন রাষ্ট্র সৃষ্টি বা দ্বিজাতিতত্ত্ব বাদ দিয়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম করার জন্য নয়। তদুপরি, শেখ মুজিব এবং তাঁর দল ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহনের পূর্বশর্ত হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে তখনকার সামরিক সরকারের অধীনে আইনগত অবকাঠামো আদেশের (Legal Framework Order) প্রতি পূর্ন আনুগত্য প্রকাশ করে তাতে দস্তখত করেছিলেন যার মূল কথা ছিল, নির্বাচনের পরে যে দলই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবে সে দল অবশ্যই পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কায়েমের মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করবে। এ ছাড়া, শেখ মুজিব নিজেও নির্বাচনে অংশ গ্রহনের পূর্বে কখনও পাকিস্তান ভেঙ্গে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেননি। তাই এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে জনগণ কর্তৃক কোন ম্যান্ডেট বা ক্ষমতা দেওয়ার কোন প্রশ্নও উঠে না। তবুও ঘটনার পরিক্রমায় যখন বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেল তখন এ দেশটির অনেক নেতাই অকারনে বলতে শুরু করলেন যে, বাংলাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যু হয়েছে এবং

www.pathagar.com

দ্বিজাতিতত্ত্ব বিরোধী হিন্দুস্থানী জাতীয় আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাই বাংলাদেশের জাতীয় নীতি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বা হিন্দুস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই বাস্তব জীবনযাপন প্রনালীতে ইসলাম ছিল অনুপস্থিত। অন্য দিকে, এ সময় যাঁরা পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বাস্তব জীবনে ইসলামী আদর্শের অনুসারী। যার জন্য, ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরের পরে বহুদিন এ দেশের রাস্তাঘাটে দাড়ি এবং টুপিওয়ালা মুসলমান দেখলেই তাদের পাকিস্তানী সমর্থক বা দালাল আখ্যায়িত করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এ দেশের একশ্রেণীর মানুষ তথা হিন্দুস্থানী সেবাদাস। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে নির্বিচারে প্রাণ দিতে হয়েছে বহু মুসলমানকে।

বাংলাদেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র থেকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলেও বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের এ বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি বাংলাদেশে। হিন্দুস্থানী সেবাদাসরা এখনও সোচ্চারভাবে বলে বেড়াচ্ছেন যে, বাংলাদেশ থেকে দ্বিজাতিতত্ত্ব চিরতরে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। এ কথা বলার একমাত্র কারণ হচ্ছে, এ সমস্ত হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীরা আসলে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তথা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না। এরা জানে, যতদিন এ দেশের মানুষ দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা আলাদা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করবে ততদিন তাদের স্বাধীনতা কেউ হরন করতে পারবে না। আর যদি এ তত্ত্ব থেকে এ দেশের মানুষের আস্থা নষ্ট করে দেয়া যায় তা হলে একদিন বাংলাদেশ হিন্দুস্থানের বিশাল দেহে লীন হয়ে না গিয়ে পারবে না। বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের ভিত্তিই হচ্ছে দ্বিজাতিতত্ত্ব। অর্থাৎ, হিন্দুস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি জনগোষ্ঠী তথা জাতি হচ্ছে বাংলাদেশী জাতি যার মূল ভিত্তি হচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তথা দ্বিজাতিতত্ত্ব।

পাকিস্তানী জামানায় পূর্ব পাকিস্তানসহ দেশের সর্বত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিসহ ইসলাম-বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল ও কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আজও বর্তমান পাকিস্তানে এ অবস্থা বহাল আছে। পাকিস্তানে কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে সেখানে সক্রিয় ব্লাসফেমী আইনের ফলে তার ন্যুনতম শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। কিন্তু পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে ইসলামপন্থী সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিসহ যে কোন ইসলাম-বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর থেকে পাকিস্তান আমলে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ফলে, স্বভাবতঃই দেশে ইসলাম এবং ইসলাম-পন্থীরা অনেকটা বিপন্ন হয়ে পরে। শেখ মুজিবের পতনের পরে জেনারেল জিয়াউর রহমান এসে যদিও ইসলামী রাজনীতির উপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন তবুও ইসলাম এবং ইসলামপন্থীদের উপর থেকে সমস্ত প্রতিকূলতা আজও দূরীভূত

www.pathagar.com

হয়নি। শতকরা নব্বইজন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে আজও মাঝে মধ্যে প্রায়শঃই বিজাতীয় আদর্শের অনুসারী একদল বিদেশী চরদের মুখে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার দাবি উচ্চারিত হচ্ছে। সত্যিই মজার ব্যাপার বটে! আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ জঘন্য ও ঘৃন্য প্রচারনা ও আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের শীর্ষে রয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ নামধারী একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। কি ঔদ্ধত্য এদের? শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশে বসে শতকরা ১০ জন অমুসলমান জনগোষ্ঠীরও সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী নয় এমন একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এহেন আপত্তিজনক ও উস্কানীমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। জনগনের সোচ্চার দাবি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা অন্য কোন দলীয় সরকারই এই উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি বা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু কেন? আমরা বুঝতে পারছি না অসুবিধাটা কোথায়?

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এ দেশের কিছু তথাকথিত কবি-সাহিত্যিক অকারণে ইসলাম, কোরআন পাক, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ), ইসলামের অন্যান্য নবী ও রাসুল এবং ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি অবিরাম কটাক্ষ ও আপত্তিজনক মন্তব্য করে চলেছেন। জনগনের কঠোর প্রতিবাদ ও রুদ্ররোষের ভয়ে এদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য এখনও দেশে আছেন। মুসলিম নামধারী এ কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন সরকারই কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং এদের কাউকে কাউকে গোপনে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সরকার সাহায্যই করেছেন। মাত্র বছর তিনেক আগে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের আমলে বাংলাদেশ হাইকোর্টের একজন বিচারক (গোলাম রব্বানী) বাংলাদেশে কোন আলেম কর্তৃক ফতোয়া প্রদানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করার মত ধৃষ্টতা দেখাবার দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শনের ফলে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদ ও গণ-আন্দোলন হয়। আর এ আন্দোলনে শহীদ হন বেশ কয়েকজন মুসলমান। পরে বাধ্য হয়ে সরকার এ রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, দেশে আওয়ামী লীগ সরকারের বদলে বিএনপির নেতৃত্বে তথাকথিত ইসলামী ভাবধারার চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও হাইকোর্টের এ রায়টি সম্পূর্ণরূপে রহিত করে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন সরকারী প্রচারমাধ্যমে অবিরাম এবং অব্যাহতভাবে ইসলাম-বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং প্রচারমূলক কার্যক্রম চলছে অবলীলাক্রমে। বিভিন্ন সময় বদল হয়ে বিভিন্ন দলীয় সরকার ক্ষমতায় এলেও ইসলাম-বিরোধী এ কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন বা ভাঁটা পড়েনি। বরং দিন দিন তা একটু একটু করে জোরদারই হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে

www.pathagar.com

তথাকথিত নারী-স্বাধীনতা, নারী-অধিকার, নারী-ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনা এবং এইড্‌স প্রতিরোধের নামে সরকারী অর্থানুকল্য ও সাহায্য-সহযোগিতায় যে প্রচারনা ও কার্যক্রম চলছে তা আর কিছুই নয়, তা হচ্ছে এ দেশের ১২ কোটি মুসলমানের টাকা দিয়ে এ দেশ থেকে তাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম উৎখাত করার এক সাংঘাতিক অনৈতিক মহড়া। এ ব্যাপারে এখনই সজাগ না হলে এবং যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে না তুললে এ দেশ থেকে ইসলাম নির্বাসিত হতে বেশী সময় লাগবে না। দেশের আলেম সমাজ এবং ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদদের অনতিবিলম্বে এ ব্যাপারে যথাযথ সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বাংলাদেশে রাতারাতি গজিয়ে উঠা হাজার হাজার এনজিও বা বেসরকারী সেবা সংস্থার ভূমিকাও বেশ ভীতিজনক। এ সমস্ত বেসরকারী সংস্থাগুলি বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে বিদেশী সাহায্যদাতাদের ইচ্ছানুযায়ী যে তথাকথিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশে তা দেশের মানুষের যতটুকু না উপকার করছে তার চেয়ে ঈমান-আকিদার দিক থেকে জাতির ক্ষতি করছে অনেক বেশী। সময় থাকতে এদের নিয়ন্ত্রন না করলে এরা জাতির সর্বনাশ করে ছাড়বে।

বিগত ১৯৯১ সন থেকে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে দুই মহিলা প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করার ফলে এবং তাঁদের প্রবর্তিত কিছু ব্যবস্থা এ দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম ও তা প্রসারের ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছে। দেশের নারী সমাজ এবং বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষিতা মেয়েরা দিন দিন ইসলামী জীবন ও সমাজব্যবস্থা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতেই এ দেশের সমাজজীবনে ইসলাম খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রী যাঁরা গত বার বছর ধরে এ দেশ শাসন করছেন এবং হয়তো ভবিষ্যতেও অনেক দিন পালাবদল করে ক্ষমতায় থাকবেন, তাঁদের কারও জীবনযাপন প্রনালীই ইসলামসম্মত বা ইসলাম-অনুসারী নয়। বরং এঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রকাশ্যে দেশে অনেক অনাকাঙ্খিত শ্রুতিকটু কথা শুনা যায়। এটা জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

এবার আমরা এমন একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করবো যা বাংলাদেশের শুধু উন্নতি ও অগ্রগতিই ব্যাহত করছে না, বরং দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে তথা অস্তিত্বের প্রশ্নেই মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যাটি হচ্ছে, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘনিষ্ঠতম মিত্র বৃহৎ প্রতিবেশী হিন্দুস্থানের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা। ঘনিষ্ঠতম মিত্রের নিকৃষ্টতম আচরনের জটিলতায় বাংলাদেশ আজ সমস্যার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বাংলাদেশ মূলতঃ তার বৃহৎ প্রতিবেশী হিন্দুস্থান কর্তৃক প্রায় চারদিক থেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। বৃহৎ প্রতিবেশী ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান সত্যিকার

www.pathagar.com

অর্থে বাংলাদেশকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে আছে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার মাত্র একফালি জায়গা সীমাবদ্ধ আছে ব্রহ্মদেশ তথা মায়ানমারের সাথে। বাকি প্রায় চারদিকের মাত্র একদিকে দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। সীমান্তের আর সমস্ত এলাকার ওপারে রয়েছে মুসলিম-বাংলা তথা মুসলিম উম্মার চিরন্তন দুশমন আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদারীত্বে বিশ্বাসী ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান। যেহেতু হিন্দুস্থানের সাথে তুল্য বাংলাদেশের কোন নৌ-শক্তি নেই তাই বঙ্গোপসাগরও বাস্তব অর্থে হিন্দুস্থানী এলাকাই।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক, সহায়ক, আশ্রয়দানকারী এবং সাহায্যকারী দেশ ছিল প্রতিবেশী হিন্দুস্থান। আজকে যে কারনে যে যাই বলুক না কেন, এটাই রূঢ় কঠিন সত্যিকথা, সে দিন হিন্দুস্থানী আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে আজকে দুনিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম ও সৃষ্টির পিছনে ছিল হিন্দুস্থান এবং একমাত্র হিন্দুস্থানের অতুলনীয় ভূমিকা। এর পেছনে কারণ যাই হোক সেটা অন্য কথা। হিন্দুস্থান না হলে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলে কিছু হতো না এ দেশে। আর কেউ অকারনে সে স্বপ্ন দেখলেও বাস্তবে তা কোনদিনও রূপায়িত হতো না। সব কিছুর পরেও ১৯৭১ সনে ডিসেম্বর মাসে হিন্দুস্থান সরাসরি পাকিস্তান আক্রমন করে না বসলে বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া ছিল বাস্তবতার দিব থেকে সুদূরপরাহত। সত্য যত রূঢ় হোক তাকে স্বীকার করে না নেয়া ভাল মানুষের কাজ নয়।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে হিন্দুস্থানের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু এর পেছনে হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এবং শঠতাপূর্ণ। হিন্দুস্থান যে বাংলাদেশের ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল তার একমাত্র প্রধান কারণ হচ্ছে, যে কঠিন ও জঘন্যতম শত্রু পাকিস্তানকে হিন্দুস্থান যুদ্ধের মাধ্যমে বা গায়ের জোরে পরাজিত ও ধ্বংস করতে পারছিল না, তাকে দ্বিখন্ডিত করে দুর্বল করার মাধ্যমে শেষ করে দেয়ার জন্যই শুধু হিন্দুস্থান সে দিন বাংলাদেশকে অযাচিত ও অবাঞ্ছিতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলিম বাংলার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্থানের ওই সময়কার সীমাহীন দরদের অন্য কোন কারণ ছিল, তা নিতান্তই আহাম্মক ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাস করবেন না বা করার প্রশ্নই উঠে না।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে শঠতাপূর্ণ হিন্দুস্থানী সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতার আসল উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে এ দেশের মানুষেরও খুব একটা সময় লাগেনি। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত লোকজন হিন্দুস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল সেই সমস্ত শরনার্থীদের নামে গোটা বিশ্ব থেকে সংগৃহীত সাহায্যের একটা বিরাট অংশই হিন্দুস্থান তার দেশের লোকজনের ভিতর ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়। চোখের সামনে তা দেখলেও তখন শরনার্থীরা হিন্দুস্থানী বন্ধুদের

www.pathagar.com

এ হীন কার্যের কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। তখন তা সম্ভবও ছিল না। এর পরে, ১৯৭১ সনের বিজয়ের পরে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় তথাকথিত যৌথ বাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধি জেনারেল ওসমানীকে আত্মসমর্পন তথা অস্ত্রসম্বরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়নি। সে দিন ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী কোন যৌথ বাহিনী নয়, হিন্দুস্থানী এবং শুধু হিন্দুস্থানী বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে উপমহাদেশ তথা মুসলিম-বিশ্বের জন্য এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল তাদেরই ভাই পূর্ব পাকিস্তানী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের কারণে। মুসলিম-বিশ্বের ইতিহাসে এ দিনটি একটি কলঙ্কজনক দিন হিসাবেই চিরদিন চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভাই ভাই ভুল বুঝাবুঝি এবং হানাহানির ফলে বিশ্ব-মুসলিম ইতিহাসে সৃষ্টি হল এক নতুন কলঙ্কজনক অধ্যায় যা সত্যিকার একজন মুসলমানকে চিরদিনই পীড়া দিবে অনাগত কাল ধরে।

পূর্ব পাকিস্তান বিজয়ের পরে হিন্দুস্থানী বাহিনী কিভাবে দেশটাকে লুটপাট করেছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই কিছুটা আলোচনা করেছি। হিন্দুস্থান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান জয় করে শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দেওয়ার প্রতিদান হিসাবে অনেক কিছুর মতই ক্ষমতা গ্রহনের প্রথম দিকেই আওয়ামী লীগ সরকার আরও একটি সুন্দর উপঢৌকন প্রদান করেন হিন্দুস্থানকে। বাংলাদেশী সরকার পূর্বেকার পূর্ব পাকিস্তানী এবং ১৯৭২ সনের বাংলাদেশী বেরুবাড়ী ছিটমহলটি হিন্দুস্থানকে উপহার হিসাবে দিয়ে দেন গদগদচিত্তে। তার বদলে অবশ্য লোকদেখানো কথা ছিল যে, হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে ওপারে অবস্থিত ছিটমহল দহগ্রাম এবং অঙ্গারপোতা যাতায়াতের সুবিধার জন্য মাঝখানের প্রয়োজনীয় করিডোর হিসাবে তিন বিঘা জমি দান করবে। ইতিহাসে এ জমিখন্ডকেই তিনবিঘা করিডোর বলা হয়। কিন্তু হিন্দুস্থান তার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সে কথা রাখেনি বা অদ্যাবধি বাংলাদেশকে চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য করিডোর তিন বিঘা জমি দান করেনি। চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকার ওই চুক্তিটি জাতীয় সংসদে যথারীতি পাশ করিয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি হিন্দুস্থানকে বেরুবাড়ী দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু হিন্দুস্থান তিনবিঘা করিডর তো বাংলাদেশকে দেয়-ই নি, এমন কি আজ পর্যন্ত ওই চুক্তিটিও তাদের আইন-সভায় পাশ পর্যন্ত করেনি। একেই বলে ব্রাহ্মন্যবাদী চানক্য কূটনীতি।

বাংলাদেশের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু (?) হিন্দুস্থান ১৯৭১ এর বিজয়ের পর থেকেই শুরু করে বাংলাদেশে তার নানান ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে অব্যাহতভাবে। এর একটি হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্মের সাথে সাথে হিন্দুস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তার চর ও সেবাদাস-দাসীদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে জাল টাকার নোট ছড়িয়ে দেয় এ দেশে। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, তখনকার আওয়ামী লীগ শাসন আমলে কোন কোন বাংলাদেশী ব্যাঙ্কের কাউন্টারে একই নম্বরসম্বলিত তিনটি পর্যন্ত জাল পাঁচশত টাকার নোট ধরা পড়েছে। এভাবে হিন্দুস্থান

www.pathagar.com

নতুন দেশটির নতুন অর্থব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এর ফলে, শেখ মুজিব আমলে বাংলাদেশের একশত টাকার বিনিময়ে খোলা বাজারে পাওয়া যেতো মাত্র তেত্রিশ টাকা। হিন্দুস্থানী অর্থ বিনিময়কারীরা রসিকতা করে তখন বলতো, তিন মুজিব এক ইন্দিরা। অর্থাৎ, শেখ মুজিবের ছবিসম্বলিত তিনখানা একশত টাকার বাংলাদেশী নোট দিলে তার বিনিময়ে ইন্দিরা গান্ধীর ছবিসম্বলিত মাত্র একখানা হিন্দুস্থানী একশত টাকার নোট পাওয়া যেতো। অথচো, ১৯৭২ সনের আগে বাংলাদেশে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে) পাকিস্তানী একশত টাকার বিনিময়ে হিন্দুস্থানী একশত চল্লিশ টাকা পাওয়া যেতো। বর্তমানে অবশ্য বাংলাদেশী-হিন্দুস্থানী টাকার বিনিময়-হার বাস্তবে কিছুটা হিন্দুস্থানের অনুকূলে থাকলেও সরকারীভাবে সমান সমান। তবে হিন্দুস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশে জাল টাকার নোট প্রবাহের কাজ এখনও একেবারেই শেষ হয়ে যায়নি।

বাংলাদেশ সীমান্তে হিন্দুস্থানের অব্যাহত গোলাগুলি, অবৈধভাবে এলাকা দখলের চেষ্টা, জোর করে হিন্দুস্থানী মুসলিম নারী-পুরুষদের বাংলাদেশের ভিতর ঠেলে দেয়া (পুশ ইন), বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশী পানি-সীমানায় জেগে উঠা দ্বীপসমূহকে নিজের বলে জবরদখল করা, সীমান্তের বাংলাদেশী এলাকা থেকে বাংলাদেশী সম্পদ ও লোকজন অপহরন করে নেয়া, চোরাচালান, প্রভৃতি নানান ধরনের অপকর্ম বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ও ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুস্থান বহু বছর থেকে গায়ের জোরে বাংলাদেশী দ্বীপ তালপট্টি জবরদখল করে আছে। হিন্দুস্থানী বন্ধুত্বের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশের গণ-মানুষের জীবন আজ অতিষ্ঠ।

তবে বাংলাদেশের প্রতি হিন্দুস্থানী বর্বরতামূলক নিষ্ঠুরতা এবং জঘন্য শত্রুতার নিদর্শনসূচক আসল অপকর্মটি হচ্ছে, হিন্দুস্থান কর্তৃক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পানি আগ্রাসন। শেখ মুজিব ১৯৭১ সনে তাঁর ৭ই মার্চের ভাষনে রেসকোর্স মাঠে সমবেত জনতার সামনে (কা'দের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তা উঁনিই ভাল জানেন) সদম্ভে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের ভাতে মারবো, আমি তোমাদের পানিতে মারবো"। শেখ মুজিব তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ১৯৭৪ সনে এক মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে দেশের লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ আদমসন্তানদের অকাল মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারলেও, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পানির জন্য খরা-বন্যায় কোন মানুষের জীবন হরন করতে পেরেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। শেখ সাহেবের অবর্তমানে তাঁর পরম বন্ধুদেশ হিন্দুস্থান সে কাজটি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজ যে ভাবে এগুচ্ছে তাতে হয়তো অচিরেই হিন্দুস্থান এ ব্যাপারে সফলকাম হবে। তবে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার আন্দোলনের কাছে হিন্দুস্থান নতি স্বীকার করলে, আল্লাহ্‌র রহমতে, হয়তো এ দেশ বেঁচে যাবে।

মরণ-ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের এক জীবন-মরণ সমস্যা। বাংলাদেশের উজানে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার ফারাক্কা পয়েন্টে বাঁধ দিয়ে গঙ্গার স্বাভাবিক পানি প্রবাহের গতিরোধ করে পশ্চিমবঙ্গের নদী ভাগীরথীতে সংযোগ দিয়ে হিন্দুস্থান

www.pathagar.com

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আর কাকে বলে!

১৯৬৫ সনের পাকিস্তান-হিন্দুস্থান যুদ্ধের পরে হিন্দুস্থান সহসা পূর্ব পাকিস্তানের অযাচিত পরম বন্ধু হয়ে যায়। ঐ সময় থেকে হিন্দুস্থানী বেতার প্রচারযন্ত্র আকাশবানী থেকে অব্যাহতভাবে এপারবাংলা-ওপারবাংলা নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করা হতে থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী জনগণের সাথে হিন্দুস্থানের কোন বিবাদ নেই, যত বিবাদ হিন্দুস্থানের তা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানদের সাথে। বরং হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানের হিতাকাঙ্খী ও পরম বন্ধু। আর পূর্ব পাকিস্তানীদের শত্রু হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। হিন্দুস্থানী এ প্রচারনা শুনে মনে হচ্ছিল, এ যেন ১৯০৫ সনের পরবর্তী সেই বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময়কার রাখিবন্ধনের নামে ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুদের ধোঁকা দিয়ে এতদঞ্চলের অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বোকা বানাবার জন্য পরিচালিত অপপ্রচারেরই পুরানো রেকর্ড নতুন করে বাজানো হচ্ছে। কিন্তু আজাদীর প্রায় বিশ বছর পরে সেই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার ইতিহাস এ দেশের মানুষ ক'জনে জানে? তাই দরদী হিন্দুস্থানী আকাশবানীর আকাশী মার্কা দরদে বিভ্রান্ত হতে এ দেশের মানুষের বেশী সময় লাগেনি। এপারবাংলা-ওপারবাংলা ছাড়াও আরও অনেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের দু'অংশের জনসাধারনের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আজগুবী বহু কথা ও গল্প প্রচার করতে থাকে সমান তালে। তখন আকাশবানী থেকে প্রচার করা হচ্ছিল যে, হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তানের কাশ্মীর সমস্যা তো শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী সমস্যা। এ সমস্যার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানীদের মাথা ঘামাবার কোনই কারণ নেই এবং পূর্ব পাকিস্তানীরা যদি পশ্চিম পাকিস্তানী তথাকথিত শোষনের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হিসাবে পাকিস্তান ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে তা হলে হিন্দুস্থানের ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য কোন সমস্যাই হবে না। তখন দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি আনন্দদায়ক সমঝোতায় পৌঁছতে মোটেই অসুবিধা হবে না। হিন্দুস্থানের এ শঠতামূলক প্রচারনার সাথে তাল মিলিয়ে একই সুরে উচ্চকণ্ঠে এ দেশের হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীরাও ওই একই কথা বলতে থাকে জনগনের মাঝে। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির ৩২-৩৩ বছর পরেও আজ কি হলো এ ব্যাপারে? ফারাক্কা বাঁধ আজ বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি সমস্যা মাত্র নয়। ফারাক্কা বাঁধ আজ বাংলাদেশের জীবন-মরন সমস্যা। মরন-ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে হিন্দুস্থান বাংলাদেশের গণ-মানুষের জীবনস্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে। এ মরন-ফাঁদের সাহায্যে হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে সমূলে ধবংস করে দিতে চাচ্ছে। এ বাঁধের মাধ্যমে হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে ভাতে-পানিতে মারার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এ বাঁধের সাহায্যে হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে শুকনা মৌসুমে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী নদীসহ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে শুকিয়ে মারার যেমন ষড়যন্ত্র করেছে, ঠিক তেমনিভাবেই বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারার যে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে তারই নাম ফারাক্কা বাঁধ। মুসলিম-বাংলার এ মরণ-ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধটি তৈরী করার পরিকল্পনা ও কার্যক্রম হিন্দুস্থান গ্রহন করে পাকিস্তান আমলেই। কিন্তু তখন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন এশিয়ার লৌহ-মানব প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানকে শুকিয়ে মারার গভীর চক্রান্ত এ সর্বনাশা বাঁধ নির্মানের বিরুদ্ধে তিনি হিন্দুস্থানকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, পাকিস্তানের সাথে এ ব্যাপারে কোন সমঝোতা ছাড়া এ বাঁধ নির্মান করলে বোমা মেরে তা উড়িয়ে দেয়া হবে। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে হিন্দুস্থান মাঝপথে এ বাঁধ নির্মানের কাজ বন্ধ করে দেয় এবং এ ব্যাপারে অব্যাহতভাবে পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ১৯৭১ সনে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন হিন্দুস্থান অতি দ্রুততার সাথে ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের কাজ এগিয়ে নিতে থাকে এবং পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানের তল্পিবাহক আওয়ামী লীগ সরকারের কর্তাব্যক্তি শেখ মুজিবের কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার নামে সেই যে ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেয়, তা আজ অবধি বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতি ন্যুনতম ভ্রুক্ষেপ না করেই সত্যিকার অর্থে একতরফাভাবেই চালু করে রেখেছে। ইতিমধ্যে, গঙ্গার পানির ন্যায্য বন্টনের জন্য বাংলাদেশ ও হিন্দুস্থানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতা সাধনের উদ্দেশ্যে যৌথ নদী-কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে আজ পর্যন্ত সাঁইত্রিশটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এ সব আলোচনা বাংলাদেশের পানির প্রাপ্য হিস্যা আদায়ের পথে কোনই অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। বরং তার উল্টোটাই হচ্ছে। প্রথম যখন ফারাক্কা বাঁধ চালু করে হিন্দুস্থান তখন বাংলাদেশকে ৪২ হাজার কিউসেক পানি দেওয়ার কথা বলেছিল। তারপরে, মাঝে মধ্যে যৌথ নদী-কমিশনের মধ্যে এবং দুই রাষ্ট্রের সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে অব্যাহতভাবে আলোচনা হচ্ছে আর এর পরে ক্রমাগতভাবে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহের পরিমান থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির ভাগ কমেই চলেছে। সর্বশেষ, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হিন্দুস্থানের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের প্রশ্নে যে চুক্তি হয় তাতে বাংলাদেশের প্রাপ্য অংশ সাব্যস্ত হয়েছিল মাত্র ২৬ হাজার কিউসেক। কিন্তু বাস্তবে সে পরিমান পানিও দেয়া হচ্ছে না বাংলাদেশকে। অথচো, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তান যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল তাতে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার পূর্বশর্ত হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের জন্য পাকিস্তানের দাবি ছিল ছাপ্পান্ন হাজার কিউসেক পানি। তখনকার তথাকথিত ঔপনিবেশিক সরকার ফারাক্কা বাঁধ নির্মান ও তা চালু করার পূর্বশর্ত হিসাবে হিন্দুস্থানের কাছে দাবি হিসাবে বেঁধে দিয়েছিল ৫৬ হাজার কিউসেক পানি আর আজকের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার মাত্র ছাব্বিশ হাজার কিউসেক পানি-প্রাপ্তিতে রাজী হয়ে বন্ধুরাষ্ট্র হিন্দুস্থানের সাথে চুক্তি করেও সে পরিমান পানি পাচ্ছে না ঠিকমতো।

www.pathagar.com

বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে পানিতে মারার ফাঁদ পেতেছে। এ ছাড়া, ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বহু নদীতে চরা পড়ে ও বালু ভরাট হয়ে নদীর নাব্যতা হারিয়ে গিয়েছে। অদূর অতীতের উত্তাল পদ্মা আজ আর প্রমত্তা পদ্মা নেই। ভয়াল পদ্মা আজ দু'তীর থেকে সংকুচিত হয়ে সংকীর্ন পানিধারা। এক সময়কার বিস্তীর্ন পদ্মার দু'পাশে আজ ধু ধু বালুরাশি। শুকনার মৌসুমে এখন পায়ে হেটেই পদ্মা পার হওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এটা বাঙ্গালীদের পরম মিত্র হিন্দুস্থানের কাছ থেকে পাওয়া অতুলনীয় 'উপহার'।

তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের পানি আগ্রাসনের এখানেই শেষ নয়। এ ব্যাপারে ফারাক্কা বাঁধ হচ্ছে হিন্দুস্থানের শুভযাত্রা মাত্র। হিন্দুস্থান তার দেশের ভিতর দিয়ে বয়ে আসা উজানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল থেকে মূলতঃ উৎসারিত এবং ভাটির দেশ বাংলাদেশের ভিতর প্রবাহিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক নদনদীর উপর বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে অচিরেই একটি মরুভূমির দেশে রূপান্তরিত করার হীন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। ৫৬ হাজার বর্গমাইল আয়তনের দেশ বাংলাদেশের প্রধান ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদনদীর প্রতিটির উপর এক একটি করে বাঁধ নির্মানের কাজ হাতে নিয়ে হিন্দুস্থান দ্রুত তা বাস্তবায়নের পথে একতরফাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে হিন্দুস্থান বাংলাদেশের কোন ওজর-আপত্তি বা স্বার্থের কথা বিবেচনা করতে একেবারেই রাজী নয়। কোন আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনই এ ব্যাপারে হিন্দুস্থানকে তার এ হীন ষড়যন্ত্র থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। যদি সত্যি সত্যি হিন্দুস্থান শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতে পারে তা হলে অচিরেই বাংলাদেশ নামক এতদিনকার শস্যশ্যামল চিরসবুজের এ দেশটি একটি ধূসর মরুভূমির দেশে পরিণত হবে। গোটা জাতিকে একত্রিত হয়ে হিন্দুস্থানী এ হীন শয়তানী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। জাতি হিসাবে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে এর কোন বিকল্প নেই।

একমাত্র ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলেই আজ বাংলাদেশের শুকনা মৌসুমে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানির দারুন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, দেশের ফসল উৎপাদন হচ্ছে মারাত্মকভাবে ব্যাহত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে শুষ্ক মৌসুমে বহু অগভীর টিউবয়েলে পাওয়া যাচ্ছে না পানীয় পানি। আর এর ফলে, বহু টিউবয়েলের পানির সাথে বেরিয়ে আসছে আর্সেনিকের মত জীবনহরনকারী মারাত্মক বিষ। দেশের নদনদীগুলি ভরাট হয়ে গিয়ে হারাচ্ছে স্বাভাবিক স্রোতধারা ও প্রয়োজনীয় নাব্যতা। শুকনা মৌসুমে দেশের বহু অভ্যন্তরে নদীর পানিতে চলে আসছে সাগর থেকে নোনা পানি। আর এর ফলে, ফসলের হচ্ছে ব্যাপক ক্ষতি এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু প্রজাতির মিঠা পানির মাছ। ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় এবং নদনদীগুলির গভীরতা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী অতি সুস্বাদু বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ আজ প্রায় দুর্লভ এবং বিলুপ্তির পথে। তা ছাড়া,

www.pathagar.com

ফারাক্কা বাঁধের কারনে বাংলাদেশের বনাঞ্চলও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে, পরিবেশের উপরও পড়ছে দারুন প্রতিকূল প্রভাব যা বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য সৃষ্টি করেছে মারাত্মক হুমকি। এ অবস্থায় হিন্দুস্থান বাংলাদেশের প্রতিটি নদনদীর উজানে হিন্দুস্থানী এলাকায় বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহের স্বাভাবিক গতি পরিবর্তিত করে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় পানি থেকে বঞ্চিত করার জঘন্য পরিকল্পনা সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত করতে পারলে বাংলাদেশের জন্য যে কি বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হবে তা চিন্তা করলে গা শিউরে না উঠে পারে না। এ দেশে হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীদের কেমন লাগছে জানি না।

অবশেষে, আমরা বিশেষ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। এ বিষয়টির প্রতি একটু আলোকপাত না করলে আমাদের সমস্ত আলোচনা আসলেই অসম্পূর্ন থেকে যাবে। তা ছাড়া, এ বইয়ের যারা পাঠক তাদের প্রতিও অনেকটা অবিচার করা হবে। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুস্থানের তরফ থেকে অযাচিত ব্যাপক সমর্থন ও আশাতীত বিপুল সাহায্যের পিছনে যে উপমহাদেশের মুসলমানদের চিরশত্রু ব্রাহ্মন্যবাদীদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা অনেক কথাই উল্লেখ করেছি। কিন্তু একটি বিশেষ দিক নিয়ে তেমন কিছুই বলা হয়নি।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে হিন্দুস্থান তার পহেলা নম্বর দুশমন পাকিস্তানকে শুধু দ্বিখন্ডিতই করতে চায়নি, সম্ভব হলে, বরং পূর্ব পাকিস্তানকে পুরোপুরি গ্রাস করে নেয়ারও পরিকল্পনা গ্রহন করেছিল। এ ব্যাপারে হিন্দুস্থান তার প্রস্তুতি শুধু তার দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে হিন্দুস্থানের কাছে বিভিন্ন দাসখত প্রদানে বাধ্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে ক্ষান্ত হয়নি। হিন্দুস্থান ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতর হিন্দুস্থানের বিশ্বস্ত ও অনুগত একদল এজেন্ট ও সেবাদাস ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলিম বাংলাকে হিন্দুস্থানের অঙ্গীভূত করে নেয়ার পথে এ দেশে যারা মুসলিম জাতীয়তাবাদ তথা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল, সেই সমস্ত লোকদের পাইকারীহারে হত্যা করার ব্যবস্থা করে। ১৯৪৭ সনের দেশবিভাগ বা পাকিস্তানকে যেমন হিন্দুস্থান কোন দিনও মেনে নেয়নি, ঠিক তেমনিভাবে এ দেশে যারা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পাকিস্তান আন্দালনে শরীক হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা লাভের পরে পরবর্তীকালে মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী যে সমস্ত মহৎ ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তখনকার পাকিস্তান এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে অতিদ্রুত ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল, তাদেরও হিন্দুস্থান কোনদিন স্বাভাবিকভাবে গ্রহন করতে পারেনি। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হিন্দুস্থান তার শত্রু এ সমস্ত মহৎ বাক্তিবর্গকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। হিন্দুস্থান এ দেশে পরিচালিত ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে অপারেশন পরিচালনার নামে হিন্দুস্থান-বিরোধী মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকে খুন করার জন্য সরাসরি কিছু হিন্দুস্থানী সামরিক গুপ্তচর নিয়োগ করে। এ ছাড়া, এ

www.pathagar.com

দেশের কিছু বিভ্রান্ত লোকজনদেরও ওই সময় ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। এর ফলে, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন নয় মাসে এ দেশের হাজার হাজার মহৎ ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে প্রাণ দিতে হয় এ সমস্ত হিন্দুস্থানী চর ও সেবাদাসদের হাতে। এ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের ভিতর স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মী ছিলেন। এদের ভিতর অনেকেই ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষেও মোটেই সক্রিয় ছিলেন না। এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের একমাত্র 'অপরাধ' ছিল, তারা ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান-বিরোধী ও মুসলিম জাতীয়তা বাদ তথা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের জাতীয় পর্যায়ের যে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব ও নেতা হিন্দুস্থানী চরদের হাতে শহীদ হন তাদের ভিতর মাত্র কয়েকজনের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করছি। এঁরা হলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর মোনয়েম খান, মৌলভী ফরিদ আহাম্মদ, খান ফজলে রব চৌধুরী (ওরফে শাহ্জাহান চৌধুরী), সৈয়দ আসাদুদ্দৌলা সিরাজী, সৈয়দ মোস্তফা আল-মাদানী প্রমুখ মহান নেতা ও ব্যক্তিবর্গ। এঁরা প্রত্যেকেই মুসলিম বাংলার স্বাধীনতা এবং জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতিতে তাঁদের মহান অবদানের জন্য এ দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমরা ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি যে, পাকিস্তানের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সময়েই সত্যিকার অর্থে এ দেশে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ওই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানেও একইভাবে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যায়। আর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের, বলতে গেলে, গোটা শাসনামলের দশ বছরই তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক উন্নয়ন ও ত্বরিত অগ্রগতির সফল নায়ক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর অতিশয় ধর্মভীরু এবং দারুণভাবে সৎ নেতা শহীদ মোনয়েম খান। অদ্যাবধি এ দেশে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মকান্ডের কথা চিন্তা করলে তার সাথে যাঁর স্মৃতি ভেসে উঠে তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সফল প্রাক্তন গভর্ণর দেশ গড়ার সফল কারিগর শহীদ মোনয়েম খান। অথচো, এই মহান নেতাকেও প্রাণ দিতে হলো জাতীয় দুশমন হিন্দুস্থানী চরদের হাতে। যখন তিনি শহীদ হন তখন তিনি রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিয়ে একেবারেই অবসর জীবন যাপন করছিলেন। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ওই সময় তাঁর কোন ভূমিকাও ছিল না। তাঁর একমাত্র 'অপরাধ' ছিল, তিনি ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান-বিরোধী এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদ তথা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ও মুসলিম বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক উন্নতি ও দ্রুত অগ্রগতির সফল কারিগর মহান জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন।

এর পরে, মৌলভী ফরিদ আহাম্মদ এর কথা বল্লে বলতে হয় যে, ওই সময়ে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনে তাঁর মহান অবদানের জন্য বিরল সৎ চরিত্রের অধিকারী মৌলভী ফরিদ আহাম্মদ মুসলিম বাংলার তওহিদী জনতার মনে চিরভাস্মর হয়ে থাকবেন। শহীদ খান ফজলে রব চৌধুরী (ওরফে শাহ্জাহান চৌধুরী) এর মত

www.pathagar.com

একজন খাঁটি ঈমানদার সাচ্চা মুজাহিদ এবং মুসলিম বাংলার উন্নয়নের জন্য নিবেদিতপ্রাণ নেতা শুধু তাঁর নিজের জন্য নয়, এ দেশের মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষাসহ সার্বিক উন্নয়নে তাঁদের বংশানুক্রমিক মহান অবদানের জন্য চিরঅমর হয়ে থাকবেন। এ ছাড়া, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সুযোগ্য পুত্র সৈয়দ সৈয়দ আসাদুদ্দৌলা সিরাজী তাঁর নিজস্ব কীর্তি এবং তাঁর পিতার মহান অবদানের জন্য যে এ দেশের মুসলিম জনগনের মনের মনিকোঠায় অবশ্যই চিরজাগরুক হয়ে আছেন এবং থাকবেন এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর সৈয়দ মোস্তফা আল-মাদানী এবং তাঁর পরিবারের বংশানুক্রমিকভাবে এ দেশের মুসলমান ও মুসলিম আন্দোলনের প্রতি তাদের মহান অবদানের জন্য যে কোন দিনও মুসলিম বাংলা ভুলে যেতে পারবে না, এ কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। এভাবে উল্লেখ করলে দেখা যাবে যে, ওই সময়ে হিন্দুস্থানী চর এবং সেবাদাসদের হাতে যে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব ও নেতা শাহাদাৎ বরণ করেছিলন, তাঁরা সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ মহান অবদানের জন্য এ দেশে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং মুসলিম বাংলা তাদের কোন দিনও ভুলে যাবে না।

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ যাতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে নিজের অস্তিত্ব সঠিকভাবে টিকিয়ে রাখতে না পারে সে উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রহরে ঠিক বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে এ দেশের বিভিন্ন অঙ্গনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে খুন ও গুম করার মত হীন কার্যে অবতীর্ন হয়। এ জঘন্য কার্যেরই অন্যতম ছিল এ দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যা। এ হত্যাযজ্ঞের আসল উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশকে মেধাশূন্য করে দিয়ে ভবিষ্যতে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে অচল করে দেয়ার মাধ্যমে হিন্দুস্থানের অঙ্গীভূত হয়ে যেতে বাধ্য করা। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর হিন্দুস্থানী সৈন্যদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের ঠিক দু'দিন আগে পাকিস্তানী সৈন্যরা বা তাদের সহায়ক এ দেশীয় কোন বাহিনী খুঁজে খুঁজে প্রত্যেকের ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের পাইকারীহারে হত্যা করবে বা করতে সাহস পাবে, এটা কোন পাগল ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না। পাকিস্তানী সৈন্য বা এ দেশের পাকিস্তান-সমর্থকগণ তখন নিজেদের জানের ভয়ে কোথায় পালাবে তার চিন্তায় অস্থির ছিলো। ও সময় তাদের পক্ষে এ কাজ করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে তো খুন করা হলো ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনেরও কয়েকদিন পরে। তখন এটা কারা করলো? আর এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, যদি সত্যিই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পিছনে পাকিস্তানপন্থীরা জড়িত থাকতো তা হলে এতদিনে বিভিন্ন সময়ে এ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী সেবাদাস শাসকগোষ্ঠী অবশ্যই তার বিচার করতো। কেঁচো খুঁড়লে সাপ বেরিয়ে আসবে, এ ভয়েই এ দেশের হিন্দুস্থানী সেবাদাস শাসকগোষ্ঠীও কোন দিন এ জঘন্য

www.pathagar.com

হত্যাযজ্ঞের বিচারকার্য পরিচালনার পথে পা বাড়াতে সাহস করেনি। আসলে, এ জঘন্য ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে অবশ্যই বিচার ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এটাই গোটা জাতির দাবি।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর অভাবিতভাবে সহসাই যখন পূর্ব পাকিস্তানী বাহিনী হিন্দুস্থানের কাছে আত্মসমর্পন করে তখন হিন্দুস্থান তার এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা পাকিস্তান-সমর্থক এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সমস্ত লোকজনদের ধরে ধরে নির্বিচারে বহুদিন ধরে হত্যা করতে থাকে। এর পরেও যারা পালিয়ে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান তারা এক সময়ে দেশের পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আদালতের মাধ্যমে আত্মসমর্পন করে দেশের বিভিন্ন জেলে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশ্যি, ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতর সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং হিন্দুস্থান-বিরোধী যে গোষ্ঠীটি ছিল, তাদের হাতে আটক পাকিস্তানপন্থী অনেক সক্রিয় সদস্য ও নেতাদেরও তখন জেলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল নিরাপত্তার খাতিরে। এই সমস্ত বন্দীদের ব্যাপারে হিন্দুস্থান বা তার এ দেশীয় সেবাদাসদের চিন্তা ছিল, পাকিস্তানপন্থী বা হিন্দুস্থান-বিরোধী এ সমস্ত নেতা-কর্মীদের আর কোনদিনও আলোর মুখ দেখতে দেয়া হবে না এবং এঁদের ভিতর যাদের খুশি নিজেদের ইচ্ছেমতো উপায়ে যথাসময়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু তাদের সে কুমতলব এবং দুঃস্বপ্ন কোনদিনও আর সফল হতে পারেনি। এ দেশের মানুষ যখন হিন্দুস্থান এবং তার দোসরদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে সমর্থ হয় তখন আর এ সমস্ত মহান জাতীয়তাবাদীদের কারাগারে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। জনরোষের ভয়ে এক সময় হিন্দুস্থানী দালাল ও সেবাদাসরা জেলে বন্দী সমস্ত তথাকথিত পাকিস্তানপন্থী দালাল তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সমস্ত মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের সসম্মানে বেকসুর খালাস করে দিতে বাধ্য হয় এবং তাদের কৃত এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানী দালালরা নিজেরাই জেলে আশ্রয় নেয়।

তবে এ সমস্ত ঘটনার মাঝেই হিন্দুস্থানী সেবাদাসদের হাতে কারাগারের মত সুরক্ষিত রাষ্ট্রীয় হেফাজতখানায় পবিত্র আমানত হিসাবে অবস্থানরত মিথ্যা অজুহাতে আটক মুসলিম জাতীয়তাবাদী কতিপয় নেতা ও কর্মীকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে খুন করা হয়। এ সমস্ত মহান শহীদদের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, চট্টলার সিংহপুরুষ পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার সক্রিয় তরুন নেতা আধুনিক চট্টগ্রামের সফল কারিকর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার ও পাকিস্তানের প্রাক্তন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট স্বনামধন্য মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী। এ মহান জাতীয়তাবাদী নেতাকে কারাগারের অভ্যন্তরে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম বাংলার এ মহান সন্তানের অবদান এ দেশবাসী এবং বিশেষ করে চট্টগ্রামের জনগন কোন দিনও ভুলতে পারবে না। শহীদ ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন আধুনিক

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আধুনিক চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং শিল্পসমৃদ্ধ বর্তমান বৃহত্তর চট্টগ্রাম মহানগরীর স্বপ্নদ্রষ্টা ও বাস্তবায়নকারী মহান নেতা। তিনি না হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই হতো না। আজকের চট্টগ্রাম মানেই হচ্ছে, বহু যত্নে তিলে তিলে গড়া শহীদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর গড়া চট্টগ্রাম। আধুনিক চট্টগ্রামের নামের সাথে শহীদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর নাম চিরদিন অমলিন হয়ে জড়িয়ে থাকবে। শহীদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীও বর্তমানে তাঁর মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বহুদিন ধরে এ দেশ ও জাতির খেদমত করে যাচ্ছেন অব্যাহতভাবে বেশ সুনাম ও দক্ষতার সাথে।

ওই সময়ে যাঁদের কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল, মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা-কর্মী ওই সমস্ত লোকদের প্রত্যেকেরই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে এ দেশ গঠন ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য কমবেশী অবদান ও ভূমিকা ছিল। ওই সমস্ত লোকদের ভিতর মুসলিম বাংলার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যাঁদের অসামান্য অবদান ছিল, সেই সমস্ত মহান ব্যক্তি ও জাতীয় নেতাও ছিলেন ব্যাপকভাবে। যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন বা দেশের বাইরে ছিলেন অথবা মুষ্ঠিমেয় দু'চারজন যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তাদের ছাড়া প্রায় সবাইকে ঢুকানো হয়েছিল কারাগারে।

ধারণ-ক্ষমতার চেয়ে আট-দশ গুণ বেশী লোকজনদের বন্দী করে রাখা হয় প্রতিটি কারাগারে। এভাবে তাদের বাধ্য করা হয় এক নিষ্ঠুর অমানবিক জীবন যাপন করতে। দেশ ও জাতির জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করার 'প্রতিদান' হিসাবে এই পেয়েছিল সে দিন এ দেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মহান সন্তানগণ। এ সমস্ত মহান ব্যক্তিবর্গের ভিতর যেমন খান এ সবুর, শাহ্ আজিজুর রহমান, খাজা খায়ের উদ্দিন, আজিজুল হক নান্না মিয়া ও হাজী সিরাজ উদ্দিন এর মত বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই ছিলেন এঁদের সাথে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ডঃ হাসান জামান ও ডঃ মীর ফখরুজ্জামানের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলিম বাংলার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণও। এ ছাড়া, মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন এবং শর্ষিনার পীর সাহেবের মত উল্লেখযোগ্য এ দেশের বহু আলেম-উলেমা ও বুজর্গ ব্যক্তিবর্গও ওই সময় হিন্দুস্থানী সেবাদাসদের নিষ্ঠুর নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের হাত থেকে রেহাই পাননি। অথচো, দেশের এ সমস্ত মহান সন্তানদের আপোষহীন সংগ্রাম ও নিরলস প্রচেষ্টার ফসলই হচ্ছে আজকের এ আধুনিক ও কমবেশী উন্নত এ দেশ। সে দিন যদি খান এ সবুর সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে না দিতেন তা হলে বৃহত্তর খুলনা আজ হিন্দুস্থানেরই অংশ থাকতো। তা হলে খুলনা অবশ্যই সে দিন পাকিস্তানের অংশ হতো না বা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা খুলনার আকাশে কোথাও দেখা যেতো না। খান এ সবুরের মত মহান মুসলিম লীগ নেতার জন্ম না হলে লোনাভূমি খুলনার আধুনিকায়ন কোন দিনও সম্ভব হতো না। খান এ সবুর না হলে খুলনার

www.pathagar.com

শিল্পনগরী দৌলতপুর, খালিসপুর বা সামুদ্রিক বন্দর মোংলা এর কথা কেউ চিন্তাও করতে পারতো না। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার তরুণ ছাত্রনেতা শাহ্ আজিজুর রহমান বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল ও সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মরহুম প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তাঁরই মন্ত্রিসভায় এ দেশের জন্য কাজ করে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন শেষে ইতিমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মুসলিম বাংলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য অতুলনীয় অবদানের অধিকারী ঢাকার নওয়াব পরিবারের সুযোগ্য সন্তান খাজা খায়ের উদ্দিন পরবর্তীকালে এ দেশ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে গেলেও বাংলাদেশ-পাকিস্তান স্বাভাবিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে যথেষ্ঠ অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এ ছাড়া, আজিজুল হক নান্না মিয়াও তো আবার বাংলাদেশের একজন মাননীয় সংসদ সদস্য হিসাবেই এ জাতির খেদমত করে গিয়েছেন বহুদিন পর্যন্ত। প্রাক্তন এমপি হাজী সিরাজ উদ্দিন বাংলাদেশে মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে এবং ঢাকা মহানগরীর কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত মেয়র হিসাবে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন ও দক্ষতা প্রদর্শন শেষে ইতিমধ্যেই জান্নাতবাসী হয়েছেন। হিন্দুস্থানী সেবাদাসদের হাতে ওই সময়ে বন্দী ও নিগৃহীত বহু জাতীয়তাবাদী নেতাই ইতিমধ্যে এ দেশের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হিসাবে বেশ সুনামের সাথে কাজ করে গিয়েছেন এবং এখনও অনেকে করে যাচ্ছেন।

এ দেশ থেকে হিন্দুস্থান-বিরোধী এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নেতাদের সমূলে উচ্ছেদ করে যথাসময়ে যাতে বাংলাদেশটাকে হিন্দুস্থান পুরোপুরি গ্রাস করে নিতে পারে সে উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান তার এ দেশীয় সেবাদাস তখনকার বাংলাদেশী পুতুল সরকারের মাধ্যমে শেষ যে বিশেষ কাজটি করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেই সেটি ছিল, ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের মুহূর্তে এ দেশের যে সমস্ত নেতা তখন পশ্চিম পাকিস্তানে বা পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে অন্যত্র ছিলেন, তাঁরা যাতে আর এ দেশে এসে জাতির খেদমত করতে না পারেন বা এ দেশে হিন্দুস্থানের অপকর্মের বিরুদ্ধে জনগনকে সংগঠিত করতে না পারেন সে উদ্দেশ্যে বহু জাতীয় নেতা ও ব্যক্তিত্বের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়। এ সমস্ত নেতাদের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সততা ও আদর্শের মূর্তপ্রতীক পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট নূরুল আমীন, পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তখনকার পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা জনাব মাহ্মুদ আলী, পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান (ঠান্ডা মিয়া), পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা কাজী আবদুল কাদের, জামায়াতে ইসলামী নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, রাজা ত্রিদিব রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এঁদের ভিতর অনেকেই অবশ্যি শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু নূরুল আমীন পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে পাকিস্তানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং করাচীতে পাকিস্তানের জনক মহান নেতা কায়েদে আযমের মাজারে তাঁরই পার্শ্বে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এ ছাড়া, ১৯৭১ সনের পর থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

জনাব মাহ্‌মুদ আলী পাকিস্তানের একজন মাননীয় ফেডারেল মন্ত্রী হিসাবে শুধু পাকিস্তান নয়, গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের সার্বিক কল্যানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর রাজা ত্রিদিব রায় বহুদিন পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করে যাওয়ার পরে বর্তমানে পাকিস্তানের একজন মাননীয় ফেডারেল মন্ত্রী হিসাবে জাতির খেদমত করে যাচ্ছেন। মুসলিম বাংলার দুর্ভাগ্য যে, হিন্দুস্থানী সেবাদাসদের ষড়যন্ত্রের ফলে জাতি দেশের এ আদর্শ সন্তান ও মহান নেতাদের খেদমত থেকে অকারণেই বঞ্চিত হলো। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে হিন্দুস্থান বা তার এ দেশীয় সেবাদাসরা জাতির এ মহান সন্তানদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের সে হীন উদ্দেশ্য অদ্যাবধি সফল হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন সফল হবে না, ইন্‌শ আল্লাহ্‌। হিন্দুস্থানের সে আশার গুড়ে বালি। অবশ্যি, সে আশা অদ্যাবধি সফল হয়নি বলেই হিন্দুস্থান এবং তার এ দেশীয় সেবাদাসরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে একের পর এক জঘন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে অব্যাহতভাবে যা আমরা ইতিপূর্বেই অনেকটা আলোচনা করেছি।

এ অধ্যায়ে আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি তাতে এটা দিবালোকের মত পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে, বিগত বত্রিশ বছরের বাংলাদেশী শাসনামলে এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরে মাত্র তেইশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের জামানায় শূন্য অবস্থা থেকে অতি দ্রুতগতিতে বহুবিধ অসংখ্য শিল্পকারখানা স্থাপনসহ দেশে যে ব্যাপক উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছিল তা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বরং উন্নয়নের সে চাকাটা বিপরীত দিকে আবর্তিত হয়ে দেশটি দ্রুত ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছে। বিগত বত্রিশ বছরে দেশে ছিটে-ফোঁটা দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোন শিল্পকারখানাই স্থাপিত হয়নি। উল্টো, পাকিস্তানী জামানায় প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শিল্পকারখানাগুলিই একে একে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বিগত বত্রিশ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস হচ্ছে স্থবিরতার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যবাহী চিরন্তন শত্রুর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল একটি জাতি রাতারাতি কিভাবে পিছিয়ে যায় সেই ধ্বংসের ইতিহাস। বাংলাদেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, বাংলাদেশ আজ একটি ধ্বংসস্তুপ। এ অবস্থায় স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তা হলে এটাই কি সোনার বাংলা? এ জন্যই কি শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ দেশের মানুষকে আলাদীনের যাদুর চেরাগের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন? এ জন্যই কি তারা একটি নিরস্ত্র জাতিকে মায়ামরিচিকার পিছনে ছুটতে বলে চরম বিপদ এবং অনিশ্চয়তার মাঝে ঠেলে দিয়েছিলেন? এ জন্যই কি মুসলিম-বাংলার লক্ষ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল? স্বাধীনতার "সোল এজেন্টরা" জবাব দিবেন কি?

www.pathagar.com

চৌদ্দ

কথায় বলে, পাপ বাপকেও রেহাই দেয় না। কথাটা যে কত সত্যি তা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বার বার প্রমানিত হয়েছে। আমাদের উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা এ কথার যথার্থতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। ১৭৫৭ সনে পলাশীর যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, তার জন্য দায়ী ছিলেন প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ও জগৎ শেঠসহ প্রধানতঃ তেরজন ক্ষমতালোভী কুচক্রী। নিয়তির এমনি অমোঘ বিধান যে, এই ১৩ জন কুচক্রীর প্রত্যেককেই তাদের জঘন্য কৃতকর্মের ফল কিছুটা অন্ততঃ এ দুনিয়াতেই ভোগ করে যেতে হয়েছে। এই ১৩ জন দুষ্কৃতিকারীর প্রত্যেকেরই হয়েছিল অপমৃত্যু। মানুষ দুনিয়াতে যে যা করবে তার যথাযথ ফল ভোগ করবে ওপারের অনন্তকালের জীবনে রোজ হাশরের মাঠে শেষ বিচারের পরে। তবে বিরল দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মানুষ দুনিয়াতে ভালমন্দ যে যাই করে তার কৃতকর্মের ফল সে এ দুনিয়াতে তার জীবদ্দশায়ই অন্ততঃ কিছুটা হলেও তা ভোগ করে যায়। পলাশীর সেই ঘটনারই মোটামুটি পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ নাটক মঞ্চায়নের মাঝে। ১৭৫৭ সনের বিপর্যয়ের নায়কদের যে করুন পরিণতি আমরা দেখেছি তাদের পরবর্তীকালের জীবনে, ঠিক একই পরিণতি ঘটেছে ইতিমধ্যে ১৯৭১ সনের বিয়োগান্ত ঘটনার জন্য দায়ী অনেক তথাকথিত নেতার জীবনেও। আর এ ব্যাপারে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যারা উপমহাদেশের মুসলমানদের অকারণ সর্বনাশের জন্য দায়ী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের জীবন দিয়ে তাদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন তারা উপমহাদেশের আজকে বর্তমান তিনটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানকালেই তাদের কৃতকর্মের ফল কিছুটা হলেও অন্ততঃ এ দুনিয়াতেই ভোগ করে গিয়েছেন। কারো কারো কোন ব্যক্তিগত রক্ষিবাহিনীও তাদের জীবনরক্ষায় কোন কাজে আসেনি। কথায় বলে, 'আল্লাহ্‌র মাইর দুনিয়ার বাইর'। ১৯৭১ সনের মুসলিম বিপর্যয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী ছিলেন, নিঃসন্দেহে, হিন্দুস্থানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি অকারণে তাঁর দেশের স্বার্থ উদ্ধারের নামে তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ পূরনের উদ্দেশ্যে একটি দ্রুত উন্নয়নশীল শান্তিকামী রাষ্ট্রকে দ্বিখন্ডিত করার মাধ্যমে উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন সংহার করেছিলেন এবং উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনাগত ভবিষ্যৎকে এক অনিশ্চিত শঙ্কার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর হিন্দুস্থানী প্রধানমন্ত্রী দিল্লীর দরবারে বিজয় উৎসবকালে বেশ সদম্ভেই ঘোষণা করেছিলেন "হাজার সাল কা বদলা লে লিয়া হাম।" তাঁর দম্ভোভরা সে প্রলাপোক্তির যথাযথ উত্তর ও ফলও তিনি অনেকটা পেয়ে গিয়েছেন তাঁর জীবদ্দশায়ই। আর তা দিয়েছেন বিশ্বজাহানের সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ভিতর সবচেয়ে যিনি বেশী ক্ষমতাশালী সেই মহাবিক্রমশালী

www.pathagar.com

বিশ্বনিয়ন্ত্রক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। তাঁর কৃতকর্মের ফল হিসাবে শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীকে জীবন দিতে হলো তাঁরই অতি বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদের হাতে।

এর পরে, পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখনকার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঝানু ও অতিধূর্ত চরম ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও পেয়ে গেলেন তাঁর কৃতকর্মের যথাযথ ফল। তিনিও প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন তাঁর পাপের অন্ততঃ কিছুটা। অদৃষ্টের এমন নির্মম পরিহাস, তিনি এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হলেন তাঁরই বিশ্বস্ত দেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল জিয়াউল হক কর্তৃক। জেনারেল জিয়াউল হককে তিনি প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন কয়েকজন জেষ্ঠ জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে। শেষ পর্যন্ত সেই জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলেই একটি রাজনৈতিক খুনের দায়ে আদালতের বিচারের মাধ্যমেই ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে প্রাণ দিতে হলো ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে। সারা দুনিয়া এবং বিশেষ করে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি বহু চেষ্টা করেও তাঁর জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। জুলফিকার আলী ভুট্টো শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গুন, রাজনীতি ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দিক থেকে ছিলেন অনন্য ও অসাধারণ। পাকিস্তানের জন্য তাঁর দরদ ও অবদানও কম ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার প্রতি তাঁর লোভ ও মোহ ছিল সীমাহীন। যার ফলে, পাকিস্তান যখন ভেঙ্গে যায় তখনও তিনি ক্ষমতার অন্ধমোহ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের ভাষায় তাই "ক্ষমতালোভী এই জ্ঞানপাপীকে" আদালতের বিচারে ফাঁসির রায় ঘোষণা শুনারও বহুদিন পরে পাকিস্তানের জেলখানায় বসে ধুঁকে ধুঁকে শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে এক সময়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হয়েছে জীবন দিয়ে।

এবার আসা যাক ১৯৭১ সনের বিয়োগান্ত নাটকের মহানায়ক শেখ মজিবর রহমানের কথায়। অনেকেই বলেন, শেখ মজিবর রহমান পাকিস্তান ভাঙতে চাননি। আর তা চাননি বলেই ১৯৭১ সনের তাঁর ঐতিহাসিক ভাষনের ইতি টেনেছিলেন "জয় পাকিস্তান" বলে। কথাটা আমিও কিছুটা বিশ্বাস করি। কারণ শেখ মুজিব আর যা-ই হোক, এতটা বোকা নিশ্চয়ই ছিলেন না যে, ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন এবং তাঁর দলের সমস্ত নেতা-কর্মীদের হিন্দুস্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিলেন অথচো নিজে আত্মগোপন না করে তাঁর বাড়ীতেই বসে রইলেন। আসলে, শেখ মুজিবের মনে, বোধ হয়, অন্য চিন্তা ছিল এবং ভিতরে ভিতরে পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে অন্য বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, শেখ মুজিব আসলে পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। তা হলে এ কথা তো না বলে উপায় নেই যে, শেখ মুজিবের রাষ্ট্রনায়কচিত প্রজ্ঞার অভাব ছিল। যে বিষবৃক্ষ তিনি নিজ হাতে রোপন করেছিলেন তার বিষফল তো তাঁকে পেতেই হবে এবং এর কিছুটা যদি তাঁকে আস্বাদন করতেই হয় তা হলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সাহসী তরুন কর্মী ও সংগঠক শেখ মুজিব

www.pathagar.com

ক্ষমতার শীর্ষে আরোহনের পথে আন্তর্জাতিক ইসলাম-বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক চমকপ্রদ ও বিয়োগান্ত ঘটনার নায়ক শেখ মুজিবকেও তাঁর এককালীন বিশ্বস্ত ও অনুগত অনুসারীদের হাতেই ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগষ্ট দিবাগত রাত্রে সপরিবারে প্রাণ দিতে হলো এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাঝে। ওই সময় শেখ মুজিবের তিন ছেলে, দুই পুত্রবধু, তাঁর সহধর্মিনী এবং তাঁর আপন ভাইসহ পরিবারের প্রায় সবাই নিহত হন। শুধু শেখ মুজিবের দুই মেয়ে, শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা ওই সময় দেশের বাইরে ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে যান। শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেন তারা কেউ রাজাকার, আলবদর, আলসাম্‌স বা তথাকথিত পাকিস্তানী দালাল ছিলেন না। যারা তাঁকে হত্যা করেছিলেন তারা ১৯৭১ সনে সবাই শেখ মুজিবেরই অনুগত ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ নেতাদের জান-মাল ও শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য রক্ষিবাহিনী নামে যে বিশেষ আওয়ামী লীগ দলীয় বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার খাতিরে তারাও কোন কাজে আসেনি প্রয়োজনের সময়।

শেখ মুজিবের পতনের পরে মাত্র তিন মাসের মধ্যে জেলখানার মত সুরক্ষিত জায়গায় সরকারী হেফাজতে থাকাকালীন অবস্থায়ই খুন হন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান চার সংগঠক ও নেতা তাজউদ্দিন আহম্মদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী এবং মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। এঁরা সবাই শেখ মুজিবের আমলে প্রভাবশালী মন্ত্রীও ছিলেন। এঁদের যারা হত্যা করেন তারাও সবাই এক সময়ে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক ও ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭১ সনে এ উপমহাদেশের মুসলিম বিপর্যয় ও সর্বনাশের জন্য যারা দায়ী ছিলেন সেই সমস্ত নেতারা সবাই ইতিমধ্যেই তাদের কৃতকর্মের কিছুটা সাজা হিসাবে তাদের জীবন বলি দিয়ে ওপারে কঠিন সাজা ভোগের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এঁদের ভিতর যাঁর যে রকম পাপের মাত্রা ছিল, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিনি সেই রকম সাজাই পেয়ে গিয়েছেন মৃত্যুর সময়। এঁদের মাঝে যিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীতে দেশটাকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ১৯৭১ এর নাটকের সেই মীর কাসিমের বুক ঘাতকের বুলেটে ঝাঁঝড়া হয়ে গেলেও দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর জন্য চোখের পানি ফেলেছিল শোকার্তচিত্তে।

ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার খাতিরে আমরা এতক্ষণ যে রুঢ় কঠিন বিষয়গুলি আলোচনা করলাম তার উপসংহারে এ কথা না বলেই উপায় নেই যে, সব কিছুর পরেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মজিবর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। যারা বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ১৯৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অনন্য, অতুলনীয় ও অবিস্মরনীয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির ফলে উপমহাদেশ বা মুসলিম বিশ্বের কি মারাত্মক ক্ষতি বা উপকার হলো সে ভিন্ন

www.pathagar.com

কথা। কিন্তু বাংলাদেশকে দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান করে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা তুলনাহীন। শেখ মুজিব না হলে বাংলাদেশ কবে, কখন, কিভাবে হতো তা বলা মুশকিল। তার চেয়েও বড় কথা, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন এ দেশ হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে ছিল তখন যদি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বন্দীদশা থেকে মুক্তি না দিতেন এবং সে সময়ে শেখ মুজিব যদি দেশে ফিরে না আসতেন তা হলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিরাজ করতো না। তা হলে বাংলাদেশ আজ ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থানের সম্প্রসারনবাদী থাবার শিকার হয়ে হিন্দুস্থানেরই একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে জম্মু ও কাশ্মীরের মতই অবর্ণনীয় নির্দয় হিন্দু শাসন ও শোষনের স্থল হয়ে থাকতো। সমস্ত কিছুর পরেও শেখ মুজিবের এ অবদান অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

শেখ মুজিবের এ অবদান স্বীকার করার সাথে সাথে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভূমিকা বা অবদানকেও কারো খাটো করে দেখা উচিত নয়। শেখ মুজিব না হলে যেমন বাংলাদেশ আন্দোলন হতো না বা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মত অবস্থার সৃষ্টি হতো না, ঠিক তেমনি সে দিন জেনারেল জিয়া না থাকলে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের যথাযথ ঘোষণা বা সংগঠনমূলক কার্যক্রমও যথাযথভাবে পরিচালিত বা সম্পন্ন হতো কিনা সন্দেহ। এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে দেশটাকে যে ভাবে আন্তরিকতা ও সততার সাথে পুনর্গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন তার তুলনা হয় না। সততার যে আদর্শ দৃষ্টান্ত জেনারেল জিয়া রেখে গিয়েছেন তা এ দেশে বিরল। তাঁর সমস্ত দোষ-ত্রুটির পরেও জেনারেল জিয়াকে তাঁর সততা, আদর্শবাদিতা এবং জাতিকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য এ দেশের মানুষ চিরদিন স্মরণ করবে।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, বাংলাদেশের এ দু'জন মহান নেতার সমর্থক ও গুনগ্রাহীরা একজনকে সম্মান দেখাতে গিয়ে অন্যজনকে যথাযথ সমাদর করতে পারছে না বা সম্মানের আসনে বসাতে রাজী হচ্ছে না। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করেন তাদের উচিত বাংলাদেশের এ দু'জন মহান নেতাকেই সমান কদর করা। ইতিহাসের নিরিখে যাঁর যতটুকু প্রাপ্য তাঁকে ততটুকু সম্মান অবশ্যই দেয়া উচিত। মনের এতটুকু উদারতা না থাকা অবশ্যই শোভন নয়।

www.pathagar.com

পনের

বাংলাদেশ আজ একটি ধ্বংসস্তুপ। ১৯৪৭ এর 'কিছু নাই' এর এ দেশে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ে অনেক কিছুই হয়েছিল। বর্তমানে ২০০৩ সনের শেষ প্রান্তে এসে আজ প্রায় সবই শেষ। আর এ "সব শেষ" এর দেশের নামই বাংলাদেশ। এরই নাম "সোনার বাংলা"। এই সোনার বাংলার মায়ামৃগ পাবার স্বপ্ন দেখিয়েই একদিন মুসলিম বাংলার কতিপয় ব্যক্তিগতভাবে উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতা এ দেশের গণ-মানুষকে ঠেলে দিয়েছিলেন এক মহাঅনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। দেশের সব কিছু শেষ হয়ে গেলেও জাতির সর্বনাশের মধ্য দিয়ে তারা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে দুনিয়াদারীর দিক থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালাভের পরে এ পর্যন্ত যারা দেশের মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য এবং নতুন জাতির হর্তাকর্তা-ভাগ্যবিধাতা তথা জাতির বাবা, চাচা, মামা-খালু হয়েছেন, বাংলাদেশ না হলে তাদের প্রায় কাউকেই হারিকেন নিয়ে খুঁজেও কোথাও পাওয়া যেতো না। বাংলাদেশ না হলে আজকে যারা দেশের পরাক্রমশালী নেতা-মন্ত্রী হচ্ছেন, তাদের ভিতর অনেকেই মন্ত্রী তো দূরের কথা, কোন স্থানীয় সংস্থা তথা মিউনিসিপালিটি বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য হতেও পারতেন না। এ ছাড়া, আজকে যারা বাংলাদেশ হওয়ার পরে খয়রাতী থেকে রাতারাতি কোটিপতি এবং শত শত ও হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক অথবা বহু গাড়ি, বাড়ী এবং শিল্পকারখানার মালিক সেজেছেন তাদের ভাগ্যেও দেশের সর্বনাশ করে সহসা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ শুধু নয়, একেবারে একলাফে তালগাছ হওয়ার সুযোগ হতো না। জাতির সর্বনাশ করে যারা এ কুকাজটি করেছেন তাদের বিচারের কাঠগোড়াতে একদিন দাঁড়াতেই হবে।

বাংলাদেশ আজ ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থানের যথেচ্ছ নিষ্ঠুর শোষনের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র। বাংলাদেশ এখন হিন্দুস্থানের বাজার। পাকিস্তানী জামানায় এ দেশে কোন হিন্দুস্থানী মাল ভর্তা খাওয়ার জন্যও খুঁজে পাওয়া যেতো না। কারন, পাকিস্তানী পন্যের তুলনায় হিন্দুস্থানী মালামাল ছিল অনেক নিম্নমানের। তদুপরি, উৎকৃষ্টমানের পাকিস্তানী পন্যের তুলনায় হিন্দুস্থানী মালের দামও ছিল বেশী। তাই হিন্দুস্থানী মালামাল ছিল এ দেশে অচল। এ ছাড়া, সীমান্ত পাহারা পাকিস্তান আমলে ছিল এত বেশী কড়া যে, চোরাচালান হয়ে কোন হিন্দুস্থানী মালামাল এ দেশে পাচার হয়ে আসাও ছিল প্রায় অসম্ভব। আর আজ চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ যারা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে তাদের ভিতর খুব বেশী নেই যাদের টাকা দিলে তারা চোরাচালানে সাহায্য করে না। পাকিস্তান আমলে যদি কখনো সম্ভব হতো তা হলে যে কোন পাকিস্তানী পন্য হিন্দুস্থানে চোরাচালানের চেষ্টা করা হতো। বিনিময়ে হিন্দুস্থান থেকে মাঝে মধ্যে চোরাই পথে আসতো শুধু বিড়ি তৈরী করার জন্য টেন্ডুপাতা। মানুষ বলতো, হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তান

www.pathagar.com

থেকে নিতে চায় প্রোটিন আর বিনিময়ে দিতে চায় নিকোটিন। ওরা তখনও আমাদের জিনিষ চুরি করে নিয়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করতো। আর তার বদলে আমাদের যা দিতে চাইতো তা গ্রহন করে এ দেশের মানুষ অকাল মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়তো। শঠতা আর কৃতঘ্নতা ব্রাহ্মন্যবাদীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

ইতিমধ্যে, হিন্দুস্থান বাংলাদেশের সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। বিগত তিন বছর ধরে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে এ 'কৃতিত্ব' অর্জন করে আছে। হিন্দুস্থানী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাংলাদেশের সব কিছু আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিকসহ এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে শৃঙ্খলা বা স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। সকল ক্ষেত্রেই আজ চলছে চরম অরাজকতা ও চরম বিশৃঙ্খলা। সমাজের প্রতিটি স্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে দুর্নীতি ও অবক্ষয়। দেশ আজ সর্বনাশের শেষ ধাপে এসে পা দিয়েছে। হিন্দুস্থান চায় না বাংলাদেশ টিকে থাকুক। ইতিমধ্যে, হিন্দুস্থান বাংলাদেশের পাটশিল্প একেবারেই ধ্বংস করে দিয়েছে। পাকিস্তান আমলের সোনালী আঁশ পাট আজ আর এ দেশের গর্ব নয়। পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার এ দেশের একশ্রেণীর হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীরা হিন্দুস্থানের হাতে তুলে দিয়েছে। এককালের গর্ব, জাতির আশা এ দেশের পাটকলগুলি প্রতিদিন একটি একটি করে বন্ধ হচ্ছে আর, অন্য দিকে, হিন্দুস্থানে নিত্য নতুন পাটকল গড়ে উঠছে।

শুধু পাটই তো নয়। ইতিমধ্যেই, হিন্দুস্থান চামড়াজাত শিল্পসহ অন্যান্য প্রায় সব পন্য ও শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজারও, বলতে গেলে, বেহাত করে নিয়েছে। হিন্দুস্থান বাংলাদেশের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে এক সময়কার সম্ভাবনাময় পান ও চা রপ্তানীর আন্তর্জাতিক বাজারও। আন্তর্জাতিক বাজারে কোথায় আছে আমাদের স্থান? বর্তমানে বিদেশে চাকরীর বাজারে মানুষ রপ্তানী করা এবং তথাকথিত পোষাক শিল্পে উৎপাদিত পন্য বিদেশে বাজারজাত করা ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার আর অন্য কোন পথ কোথায়? পোষাক শিল্পের নামে দেশে সে বৃহদাকারে দর্জীকারখানাগুলি গজিয়ে উঠেছে তাও অদূর ভবিষ্যতে টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। নিম্ন বেতনভুক্ত দেশের এক শ্রেণীর স্বল্পআয়ের এবং বিশেষ করে সমাজের গরীব মেয়েদের অবাধ শোষনের ক্ষেত্র এ তথাকথিত পোষাক শিল্প পাশ্চাত্যের বাজারে বর্তমানে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে তা একদিন প্রত্যাহৃত হবেই। তখন এ শিল্পের টিকে থাকা বড় মুশকিল হবে।

সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ তো দিন দিন আমাদের সঙ্কুচিত হয়েই যাচেছ। জাতি হিসাবে টিকে থাকার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র সম্ভাবনাময় সম্পদ তথা কাঁচা মাল আছে শুধু গ্যাস। গ্যাস ইতিমধ্যেই দেশের সার্বিক উন্নয়নে কিছুটা ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে এই প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ও ব্যাপক ব্যবহার করে আমরা বেশ লাভবান হতে পারবো বলে মনে হয়। অনেক শিল্প

www.pathagar.com

গড়ে উঠতে পারে এ সম্পদের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ আশার আলো এ গ্যাস সম্পদের উপরও নজর পড়েছে হিন্দুস্থানী লুটেরাদের। হায়েনারা ছলে বলে কৌশলে লুটে নিতে চায় জাতির শেষ ভরসা এ প্রাকৃতিক সম্পদ, গ্যাস। গ্যাস পাবার জন্য হিন্দুস্থান বাংলাদেশের সরকার ও কর্তাব্যক্তিদের ভয়ভীতি ও লোভ, যখন যা দরকার তাই দেখাচ্ছে। দেশের এ অমূল্য সম্পদ রক্ষা করার জন্য জাতিকে ইস্পাত-কঠিন ঐক্য গড়ে তোলে রুখতে হবে বিদেশী হায়েনাদের। এমন অবস্থায়ই শুধু এ দেশীয় হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীরাও সাহস পাবে না দেশের সর্বনাশ করতে।

১৯৭১ সন পর্যন্ত হিন্দুস্থান থেকে যেখানে একমাত্র বিড়ির টেণ্ডুপাতা ছাড়া আর কিছুই আসার ছিল না এ দেশে, সেখানে আজ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৩২ বছর পরে, বলতে গেলে, সব কিছুই আসছে হিন্দুস্থান থেকে সোনার বাংলায়। গাড়ী, ট্রাক, যন্ত্রপাতি ও শিল্পকারখানার উৎপাদিত পন্যসহ প্রসাধন দ্রব্যসামগ্রী, চাল, ডাল, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, চিনি, লবন, কি না আসছে বাংলাদেশে বর্তমানে হিন্দুস্থান থেকে? হায়রে স্বাধীনতা! হায়রে দুর্ভাগা জাতি!

বাংলাদেশটাকে নিষ্ঠুরভাবে শোষন করার পরেও কিন্তু হিন্দুস্থান তার আসল শয়তানী মতলব থেকে দূরে সরে যায়নি। হিন্দুস্থান এ দেশটাকে ধ্বংস করে দেবার উদ্দেশ্যে এ দেশের ভবিষ্যৎ আশাআকাঙ্খার প্রতীক তরুণ সমাজের সর্বনাশ করার উপায় হিসাবে অনেক কিছু করার পরেও তার আসল কাজ থেকে বিরত থাকেনি। আগে যেমন এ দেশে হিন্দুস্থান প্রোটিনের বদলে নিকোটিন হিসাবে টেন্ডুপাতা পাচারের চেষ্টা করতো, বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পরে হিন্দুস্থান এ দেশে বহু চোরাচালানী সামগ্রীর ভিতর জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার উপায় হিসাবে অব্যাহতভাবে মাদকদ্রব্য তালিকায় হেরোইন এবং মাদক জাতীয় পানি ফেনসিডিল পাঠাচ্ছে অবাধে এবং বিপুল পরিমানে। এর ফলে, দেশের প্রচুর সংখ্যক তরুণ আজ মাদকাশক্ত হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে এবং অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে দিন দিন বর্ধিত হারে। মাদক গ্রহণ করে দেশের তরুণদের অনেকেই ঢলে পড়ছে অকালমৃত্যুর কোলে। দেশ ও জাতি আজ এক মহাসংকটের মাঝে নিপতিত।

মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে জনে জনে বা পৃথিবীর দেশে দেশে এক রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে তো শুধু উন্নত জীবনধারন বা সার্বিক ভাগ্য-পরিবর্তনের জন্যই। নিশ্চয়ই কেউ তার বা তাদের সর্বনাশ করার জন্য আলাদা হয় না। কিন্তু ১৯৭১ সনে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে কি পেলো মুসলিম বাংলা? হয়তো কেউ কেউ বলবেন যে, পাকিস্তানের সাথে একত্রে থাকা তখন আর সম্ভব ছিল না। ধরে নিলাম, তাদের কথাই ঠিক। কিন্তু এ অবস্থাটা তো সৃষ্টি হয়েছিলো ১৯৭০ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে বিপুলভাবে। কিন্তু এও তো বাস্তব যে, আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে একটি আসনও পায়নি পশ্চিম পাকিস্তানে। তার চেয়েও বড় কথা, আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

পাকিস্তানের অন্যান্য সকল দলের মতই নির্বাচনে যাওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে এল.এফ. ও বা "আইনগত অবকাঠামো আদেশ" মালায় দস্তখত করে নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করে পাকিস্তানে একটি শক্তিশালী ফেডারেল সরকারের অধীনে প্রেসিডেন্ট শাসিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তখনকার সামরিক সরকারের নিকট। তখন তো আওয়ামী লীগ অন্য কোন প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু নির্বাচনের পরে সহসা আওয়ামী লীগ তথাকথিত ছয়দফার প্রশ্নে এত অনড় হয়ে গেলো কেন? কা'দের ইশারায় বা কা'দের নির্দেশে আওয়ামী লীগ এ কাজটি করেছিল? কোন প্রভুর কথা আওয়ামী লীগ সে দিন অমান্য করতে পারেনি? দয়া করে, আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ জবাব দিবেন কি? সবচেয়ে বড় কথা, ছয়দফা বাস্তবায়ন করলে বা মেনে নিলে এতে এক পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে নতুন পাঁচটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে এ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নিয়ে নতুন করে একটি কণফেডারেশন গঠন করার কথা বলা হয়েছিল প্রকারান্তরে। কনফেডারেশন তো কোন রাষ্ট্র নয়। কনফেডারেশন তো কতকগুলি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি ইউনিয়ন মাত্র। এ অবস্থায় তো শুধু পূর্ব পাকিস্তানই আলাদা হয়ে যেতো না। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশও তো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আলাদা হয়ে যেতো বা আলাদা করে দিতে হতো। কিন্তু শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ এ সর্বনাশা পথে পাকিস্তানকে ঠেলে দিতে চাইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের কোন নেতা বা জনগণ তো সেটা একেবারেই চিন্তা করতেন না। তা হলে কে দিয়েছিল শেখ মুজিবকে এ হটকারী পরামর্শ দেবার অধিকার? দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও এ নজির আছে বলে তো আমাদের জানা নেই যে, কোন একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বা জনপ্রতিনিধিরা সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ বা জনপ্রতিনিধিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করে। আওয়ামী লীগ তো ১৯৭০ সনের নির্বাচনের পরে তাই করেছিল। কিন্তু কেন? পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে ১৯৭০ সনের নির্বাচনেই শুধু প্রথমবারের মত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ তথা কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন দেশের সার্বিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মোট তিন শত আসনের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১৬২টিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। তাই আওয়ামী লীগের ভাষায় এতদিন পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে যে বঞ্চনা করেছিল তা সমূলে দূর করে উল্টো জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পশ্চিম পাকিস্তানকে তার ন্যায্য ভাগ থেকেই তো পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চিত করার সুযোগ পেতো। আর তা করার অধিকার তো এ দেশের জনগণ শেখ মুজিবকেই দিয়ে দিয়েছিল। তা হলে কেন তা না করে অন্য পিচ্ছিল এবং বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়ালেন তিনি? কে বা কারা তাঁকে সে পরামর্শ দিয়েছিল?

বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতা ও প্রবক্তা এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক ও ঘোষক, এ দু'জনের শাসনামলেই এ দেশের মানুষ বহুবার শুনেছে যে, সোনার বাংলায় স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। এতদিনে

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই স্বপ্ন-সাধের সে সোনার বাংলা কায়েম হয়ে মানুষ স্বাধীনতার সে সুফল পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষ যা পেয়েছে তাতে তো তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জীবন যে তাদের আজ বড় দুর্বিসহ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আয়-রোজগার তো সত্যিকার অর্থে মোটেই বাড়েনি। বরং আগে দেশে তাদের জন্য কাজ করার যে সুযোগ ছিল, দিন দিন তা তো শুধু সংকুচিতই হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে নতুন নতুন শিল্পকারখানা তৈরী হয়ে নিত্য নতুন কর্মসংস্থান হওয়ার বদলে পূর্বেকার কল-কারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাবার ফলে দেশে এতদিন যে চাকরী-বাকরী ছিল তাও তো দিন দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষ তো এটা চায়নি। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রবক্তারাও তো সে দিন তাদের এ কথা বলেননি। সে দিন তো দেশের মানুষকে অনেক রঙিন স্বপ্নের কথা বলা হয়েছিল। তা হলে সে সব কি নেতাদের ধাপ্পাবাজি ছিল? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দামের কথা বিবেচনা করলে মানুষ যে অনেক ঠগে গিয়েছে। জাতি যে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ একটি মাত্র জিনিষের পূর্বেকার এবং বর্তমান মূল্যের তুলনামূলক আলোচনা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সনে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান আজাদী লাভের সময় পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলা তথা কলিকাতা ও ঢাকা, দু' নগরীতেই এক কেজি (তখন ওজন করা হতো সেরের মাপে) চালের দাম ছিল মোটামুটি পঁচিশ পয়সা। তখনকার দিনে টাকা, আনা ও পয়সায় হিসাব করা হতো। পাকিস্তানী জামানার ২৩ বছর শেষে ১৯৭১ সনে বেড়ে ঢাকা বা পূর্ব পাকিস্তানে এক কেজি চালের দাম দাঁড়ায় সর্বোচ্চ পঁচাত্তর পয়সা (তখনকার বার আনা আওয়ামী লীগের ভাষ্য অনুযায়ী)। একই সময় হিন্দুস্থানের পশ্চিম বাংলা বা কলিকাতায় এক কেজি চালের দাম ছিল প্রায় তিন টাকা। আর আজ বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রায় ৩২ বছর পর এখানে অর্থাৎ ঢাকায় এক কেজি চালের দাম মাত্র আঠার থেকে বিশ টাকা। অথচো হিন্দুস্থানে সেই এক কেজি চালই বিক্রি হচ্ছে মাত্র সাত থেকে আট টাকায়। দেশ আলাদা হওয়ার পরে সবচেয়ে কম দাম বেড়েছে চালের। কিন্তু তুলনা করে দেখা গেল যে, সবচেয়ে যে জিনিষটির দাম বেড়েছে কম, তাও ১৯৭১ সনের তুলনায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ গুণ বেড়েছে বাংলাদেশে। অন্যান্য জিনিষপত্রের দামের কথা বললে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে বিগত ৩২ বছরে বাংলাদেশের জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে গড়ে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ গুণ। সোনা বা জমির দাম হিসাব করলে দেখা যাবে যে, সে ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে পঞ্চাশ থেকে একশত গুণ। কিন্তু বাংলাদেশে জিনিষপত্রের দাম হু হু করে এত বেড়ে গেলেও হিন্দুস্থানে তথা পশ্চিম বাংলায় তো বেড়েছে মাত্র দুই থেকে তিন গুণ। ডবল স্বাধীন হয়ে আমাদের দেশের জিনিষপত্রের বাজারে এমন করে আগুন লাগলো আর হিন্দুস্থানে তার তাপটুকু পর্যন্তও পৌঁছলো না, এটা কেমন কথা? এ কেমন স্বাধীনতার সুফল পেল দেশবাসী? স্বাধীনতা পেলাম আমরা আর তার মজা লুটছে কি তা হলে ব্রাহ্মন্যবাদীরা ? আমাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের মঙ্গলের

www.pathagar.com

জন্যই কি তা হলে আমরা ১৯৭১ সনে অনিশ্চয়তার মাঝে ঝাঁপ দিয়েছিলাম?

হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে শুধু শোষন করতে চায় না। হিন্দুস্থান প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশটাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে চায়। আর সে পথেই হিন্দুস্থান সতর্কভাবে অতিদ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। আসলে, হিন্দুস্থান এতদঞ্চলের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি তার করায়ত্ব করে গোটা উপমহাদেশ এবং সম্ভব হলে, গোটা সার্ক এলাকা নিয়ে একটি বিশাল ব্রাহ্মন্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে ১৯৭১ সনে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নয়, পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলনে প্রয়োজনীয় যা কিছু করেছিল। এ কারণেই হিন্দুস্থান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করে চলেছে। হিন্দুস্থান চায় না বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বা অন্য কোন দিক থেকে মজবুত একটি ভিতের উপর স্থিতিশীল হয়ে দাঁড়াক। এ জন্যই আজ বাংলাদেশের সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুস্থান সব সময়েই বাংলাদেশের ভিতর অস্থিরতা জিয়িয়ে রাখতে চাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যেই হিন্দুস্থান বাংলাদেশের সমস্ত শিল্পকারখানা ধ্বংস করে দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে এ দেশটাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারেই পঙ্গু করে দিয়েছে। হিন্দুস্থান তার কুমতলব হাসিল করার জন্যই বাংলাদেশে চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। আর এ কারণেই হিন্দুস্থান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছে পানি আগ্রাসন, মাদক প্রেরন, বিপুল অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও বিস্ফোরক সরবরাহ, দেশের ভিতর অবিরাম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, সীমান্ত সংঘর্ষ, পুশ ইন এবং ছিনতাই, রাহাজানি ও খুনখারাপিসহ নানান ধরনের অপকর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য।

হিন্দুস্থান চায় বাংলাদেশ কাশ্মীর বা সিকিমের মত হিন্দুস্থানের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে যাক। এ স্বপ্নে বিভোর হয়েই হিন্দুস্থান যা কিছু করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত উপজাতীয় সমস্যা, বঙ্গভূমি আন্দোলন এবং বাংলাদেশে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক তথা হিন্দু নির্যাতন সমস্যা, এ সবই তো হিন্দুস্থান কর্তৃক সৃষ্ট এবং মনগড়া সমস্যা। অথচো, হিন্দুস্থান তার মনগড়া ও আজগুবী এ সমস্যাগুলি নিয়ে বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে কত না অপপ্রচার চালাচ্ছে। হিন্দুস্থান যে তার দেশে ডেকে নিয়ে পার্বত্য এলাকার উপজাতীয় তরুনদের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে, এটা কে না জানে? বঙ্গভূমিওয়ালারা তো হিন্দুস্থানী নাগরিকই। হিন্দুস্থানী নাগরিকদের দিয়ে খোদ হিন্দুস্থানে বসে হিন্দুস্থানী সরকার নিজেরাই চালাচ্ছে এ আন্দোলন। আর তথাকথিত সাম্প্রদায়িক নির্যাতন তো শুধু হিন্দুস্থান এবং তার এ দেশীয় কতিপয় সেবাদাস-দাসীদের প্রচারিত সমস্যা মাত্র। কি অভিনব প্রচারনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে! হিন্দুস্থান তার দেশে প্রতি বছর অব্যাহতভাবে একের পর এক মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানাবার পাঁয়তারা করছে এবং অবিরাম দাঙ্গা সৃষ্টি করে খুন করে যাচ্ছে হাজার হাজার নিষ্পাপ মুসলমান। এর কোন খবর নেই,

www.pathagar.com

অথচো উল্টো, হিন্দুস্থান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বহির্বিশ্বে সাম্প্রদায়িক নিধন ও নির্যাতনের বানোয়াট কাহিনী প্রচার করে যাচ্ছে। চানক্য কূটনীতি একেই বলে! বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীদের মনে এ জন্য কি একটুও পীড়া দেয় না?

দেশটাকে পুরোপুরি গ্রাস করার মাধ্যমে হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে 'পূর্ণ-স্বাধীনতা' প্রদানের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় গুপ্তচর সংস্থা "র" (RAW) কে লেলিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। হিন্দুস্থানের এ গুপ্তচর সংস্থাটি ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে অনেক অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ পরিচালনার মাধ্যমে তার দক্ষতার প্রমান দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে যত অপকর্ম হচ্ছে এর প্রায় প্রতিটির পিছনেই "র" এর সক্রিয় হাত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র বাকী নেই যেখানে এর সর্বগ্রাসী হাত প্রসারিত হয়নি। "র" এর মাধ্যমে হিন্দুস্থান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনে প্রতিবছর হাজার হাজার হিন্দুস্থানী চর তথা হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীদের পিছনে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করছে। ফলাফল যা অর্জন করেছে ইতিমধ্যে তা তো খারাপ নয়!

বাংলাদেশকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিতর। বাংলাদেশে বর্তমানে এমন কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল নেই যেখানে হিন্দুস্থানের গুপ্তচর সংস্থা "র" এর সর্বব্যাপ্ত হাত প্রসারিত হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে রয়েছে "র" এর সরাসরি যোগাযোগ ও সম্পর্ক। এ সমস্ত নেতাদের "র" প্রতিমাসে উল্লেখযোগ্য পরিমান মাসোহারা দিয়ে যাচ্ছে নিয়মিতভাবে। এ ছাড়া, বাংলাদেশের প্রতিটি সাধারণ নির্বাচণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের সময় হিন্দুস্থান তার স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে "র" এর মাধ্যমে হিন্দুস্থানের পছন্দসই এক বা একাধিক দলকে নির্বাচনের সময় প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান দিয়ে যাচ্ছে রীতিমতো। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আওয়ামী লীগ বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় আছে অন্ততঃ ১৯৭০ সনের নির্বাচন থেকে। তবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলিকেও হিন্দুস্থান একেবারেই নিরাশ করছে না।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় একশত পঞ্চাশটির মত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে। এদের ভিতর সর্বমোট মাত্র বিশ থেকে পঁচিশটি দলের মোটামুটি কিছু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আছে। বাদবাকীদের অস্তিত্ব শুধু নামেই আছে, কামে নেই। আর সত্যিকার অর্থে, এদের ভিতর মাত্র আট-দশটি দলের সক্রিয় কার্যকলাপ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, জাসদ, কম্যুনিষ্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি খেলাফত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

এর মধ্যে মুসলিম লীগ হচ্ছে উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সংগঠন। এই রাজনৈতিক দলটির মাধ্যমেই ১৯৪৭ সনে মহান নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দুনিয়ার বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ দেশ পাকিস্তান আজাদী লাভ করেছিল। আর পাকিস্তান সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বাস্তব ফসলই হচ্ছে আজকের এ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। উপমহাদেশের মুসলিম আজাদী এবং স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে মুসলিম লীগের রয়েছে এক অতুলনীয় গৌরবোজ্জল ভূমিকা ও ইতিহাস। হিন্দুস্থানের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে এই চিন্তায় মুসলিম লীগ ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ সৃষ্টির বিপক্ষে ছিল। আর এই বিশেষ কারণে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে মুসলিম লীগ একটি বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হয়। এ ছাড়াও, দলীয় নেতৃত্বের প্রশ্নে অহেতুক কোন্দল এবং কিছু আদর্শগত কারণে মুসলিম লীগ আজ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে বেশ দুর্বল অবস্থানে আছে। আরও একটি কারণে মুসলিম লীগের দলীয় কার্যক্রম আজ স্থবির হয়ে পড়েছে। সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমানে রাজনীতি বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুসলিম লীগের হাতে আজ টাকা নেই। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে ক্ষমতায় বসেই তখনকার আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার মুসলিম লীগের তহবিল তিন কোটি টাকা এবং ঢাকার শাহ্‌বাগে অবস্থিত তার দলীয় কার্যালয় ও তৎসংলগ্ন সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। তখন থেকে মুসলিম লীগ যে তহবিল সমস্যায় পড়েছে তা থেকে আজ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারেনি। এ ছাড়া, এ দেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে নয়, একমাত্র মুসলিম লীগকেই হিন্দুস্থান তার শত্রু হিসাবে টার্গেট করে নিয়েছে। তাই মুসলিম লীগ যাতে আর বাংলাদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সে ব্যাপারে হিন্দুস্থানও বেশ সক্রিয় আছে। মুসলিম লীগ বহুধা-বিভক্তির পিছনে "র" এর যথেষ্ট অবদান আছে। এ ছাড়া, এ দেশের তথাকথিত স্বাধীনতার-স্বপক্ষশক্তি নামধারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিও চায় না মুসলিম লীগ আবার শক্তিশালী অবস্থানে আসুক। তা হলে যে, জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে এ সমস্ত দলগুলির সমস্ত কাহিনী ও কার্যকলাপ দেশবাসী পুরোপুরি জেনে যাবে।

মুসলিম লীগ ছাড়া ছোট দলগুলির মধ্যে জাসদ, কম্যুনিষ্ট পার্টি, নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সাংগঠনিক দিক ও জনপ্রিয়তার বিচারে দেশে তেমন শক্তিশালী নয়। এর পরে আসে জাতীয় পার্টির নাম। ক্ষমতায় এসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ গঠন করেছিলেন এ দলটি। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরে এরশাদের পতন হলে এ দলটিও ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে এ দলটির প্রতিও দেশে জনগনের তেমন আস্থা নেই। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এ দলটির আসল নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ হচ্ছেন এমন এক নেতা যাঁর ব্যক্তিচরিত্রের এমন কোন দিক নেই যা কলুষিত নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এযাবৎকালের ভিতর

www.pathagar.com

যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদই হচ্ছেন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা। তাঁর দলে অন্য নেতা যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও প্রায় সবারই একই অবস্থা। যার ফলে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী সময়কাল শাসন ক্ষমতায় থাকার পরেও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে বহু দুর্নীতির মামলায় আসামী হয়ে ইতিমধ্যেই দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়েছে এবং বিগত নির্বাচনে তিনি দুর্নীতির দায়ে অংশগ্রহন করতে পারেন নি। জাতীয় পার্টি আজ একটি ক্ষয়িষ্ণু দল। ক্ষমতার জন্য যারা একদিন এ দলে ভীড় করেছিলেন তারা অনেকেই এতদিনে আবার অন্য দলে চলে গিয়েছেন।

জাতীয় পার্টির পরেই আসে জামায়াতে ইসলামী (বাংলাদেশ) এর নাম। এ দলটিও প্রতিষ্ঠাকালের দিক থেকে বেশ পুরানো। ১৯৪১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ দলটি। বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ভিতর জামায়াতে ইসলামীই হচ্ছে সাংগঠনিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দল। কিন্তু নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ দলটির রয়েছে মারাত্মক দুর্বলতা। স্ববিরোধিতাই হচ্ছে এ দলটির বিশেষ সমস্যা। নীতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রশ্নে এ দলটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একেবারেই সমর্থ নয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এ দলটি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ১৯৭১ সনে আবার এ দলটিই পাকিস্তান রক্ষার প্রশ্নে তার দলীয় নেতা-কর্মীদের কার্যকলাপের ফলে অনেক দুর্ণাম কামিয়েছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে, ১৯৭১ সনে জামায়াতে ইসলামীসহ পাকিস্তানপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ এবং এদের পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দানকারী হিন্দুস্থান অকারণেই অনেক মিথ্যা, আজগুবী ও বানোয়াট কাহিনী প্রচার করে দুনিয়ার বুকে এ দলগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছিল। পাকিস্তানী জামানা শেষ হবার পরেই এ দেশে জামায়াতে ইসলামী মোটামুটি একটা শক্তিশালী অবস্থানে এসেছে। বর্তমানে এ দলটির নিয়ন্ত্রনে রয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের মত একটি অতি লাভজনক ইসলামী শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক। এর ফলে, এ দলটির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বেশ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া, জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির নামে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একটি শক্তিশালী ছাত্র ও যুব সংগঠন। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব আরও সক্রিয় ও গতিশীল হলে এ আদর্শ ছাত্র ও যুব সংগঠনটিকে কাজে লাগিয়ে এ দেশে ইসলামী আন্দোলনকে আরো অনেক বেশী বেগবান ও সফল করা যেতো। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে ধীরে ধীরে জামায়াতে ইসলামীর অনেক নেতাই বেশ অর্থসম্পদ ও টাকা-পয়সার মালিক হয়ে গিয়েছেন। এর ফলে, বর্তমানে অনেক নেতাই ইসলামী আন্দোলনের প্রতি অনেকটা বিমুখ ও নিরুৎসাহী হয়ে কিছুটা আয়েশী ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এটা এ দেশে সার্বিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি করেছে। তদুপরি, ইদানিং এ দলের অনেক নেতাই এখন আন্দোলনের চেয়ে

www.pathagar.com

ক্ষমতার স্বাদ গ্রহনের জন্য বেশ উদগ্রিব হয়ে পড়েছেন। এর ফলে, বিগত কয়েক বছর ধরে জামায়াতে ইসলামী ইসলামপন্থী দলগুলির সাথে আন্দোলন বা নির্বাচনের ব্যাপারে কোন জোট বা মৈত্রীবন্ধন গঠন না করে বরং ইসলাম-বিরোধী বা ইসলাম-নিরপেক্ষ দলগুলির সাথে আঁতাত গঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জামায়াত অনেকটা লেজুড়বৃত্তিই শুরু করে দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের দোহাই দিয়ে এতদিন বলতো, নারীনেতৃত্ব না-জায়েজ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিগত ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী তার প্রচারিত আদর্শের বিরোধিতাস্বরূপ যথাক্রমে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এর সাথে আঁতাত গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়। জামায়াত গত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপির সাথে চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শরীক হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছে। অথচো, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-এ দু'দলেরই সর্বোচ্চ প্রধান হচ্ছেন দু'নেত্রী। এ দু' মহিলারই জীবনযাপনপ্রণালী আবার ইসলামী বিধিবিধানের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ অবস্থায় দেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে ভাবছে, এমন মহিলাদের পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে কি ইসলাম কায়েম করবে? এ ছাড়া, জামায়াতে ইসলামীর বহু নেতা-কর্মীর ভিতর এমন একটা ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক ধারনা রয়েছে যে, এ দেশে জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীরাই হচ্ছে একমাত্র খাঁটি মুসলমান, অন্যরা সত্যিকার মুসলমান নয়। অপর দিকে, এ দেশের বহু আলেম-উলেমাগণ আবার মনে করেন যে, জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীরা হচ্ছে ইসলামের ব্যাপারে দলটির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীর ভ্রান্ত মতবাদের অনুগামী এবং সত্যিকার ইসলাম থেকে অনেকটাই বিচ্যুত। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পথে সবচেয়ে বড় দল জামায়াতে ইসলামী নিয়ে বিরাজমান এ দ্বন্দ্ব এ দেশে ইসলামী আন্দোলন ও তার সাফল্যের জন্য মোটেই সহায়ক নয়।

এবার আমরা আলোচনা করবো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিয়ে। ইতিপূর্বেই অবশ্য আমরা বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দল দু'টি নিয়ে অনেকটা আলোচনা করে ফেলেছি। আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলাদেশ আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের প্রচার ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রবক্তা ও সংগঠক দল। পাকিস্তান আজাদী লাভের পরে এ দেশের কতিপয় রাজনৈতিক নেতা যাঁরা তথাকথিত বৃহৎবাংলা বা যুক্তবাংলার সমর্থক ছিলেন তাঁরা মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৪৯ সনে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে এ সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত ন্যায্য দাবি আদায়ের ব্যাপারকেই এ দলটি গঠনের উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, এ দলটির নাম থেকে "মুসলিম" অংশটি বাদ দিয়ে শুধু আওয়ামী লীগ করা হয়। দলীয় নামের এ পরিবর্তনের কারণ ছিল প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, এ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে এ দেশে তখনও সক্রিয় অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের পাকিস্তানী অংশের হিন্দু রাজনৈতিক

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ যাতে এবার দ্বিধাহীনচিত্তে নবগঠিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগে যোগদান করে দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে এ দলটির প্রতি সমর্থক হিসাবে পেতে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে হিন্দুস্থানের জানী-দুশমন মুসলিম লীগের সৃষ্ট ও শাসিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে তার কাজে হিন্দুস্থান সরকার সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। কালের বিবর্তনে আওয়ামী লীগ এ দু'টি লক্ষ্য অর্জনেই সফল হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ এ দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার চেয়ে দেশের মুষ্ঠিমেয় সংখ্যালঘু এবং বিশেষতঃ হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির দিকেই বেশী আগ্রহী, উৎসাহী ও নিবেদিতপ্রাণ। তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারে বিশ্বের অন্য যে কোন দেশের চেয়ে হিন্দুস্থানের স্বার্থরক্ষার জন্যই আওয়ামী লীগ অনেক বেশী তৎপর। দেশী হিন্দু এবং বিদেশী হিন্দুস্থানী স্বার্থ উদ্ধারই আজ আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতি। স্বভাবতঃই, এ জন্য আজ আওয়ামী লীগ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং হিন্দু জনসাধারনের সাধারণভাবে একচেটিয়া সমর্থনধন্য রাজনৈতিক দল।

সর্বশেষে আসা যাক বিএনপি বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কথায়। বয়সের দিক থেকে এ দলটি একেবারেই নবীন। মাত্র সে দিন জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ১৯৭৮ সনে এ দলটি গঠন করেন। দলটি গঠন করার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানগণ এ দলটির প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক জনসমর্থনধন্য এ দলটির বর্তমান নেতা-নেত্রীরা এসে এ দলে ঠাঁই নিয়েছেন পূর্বে বিরাজমান এ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে। এঁদের একটি বিরাট অংশ এসেছেন ১৯৭১ সনের পাকিস্তান সমর্থক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রধানতঃ মুসলিম লীগ এবং পিডিপি থেকে। এ ছাড়া, এ দলের বহু নেতা আগে তথাকথিত বাম রাজনৈতিক দলে সক্রিয় ছিলেন। এ দলটিতে এসে জড়ো হয়েছেন বহু প্রাক্তন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীও। মূলতঃ, হিন্দুস্থান এবং আওয়ামী লীগ নীতি ও আদর্শ বিরোধী নেতা, কর্মী ও সমর্থকরাই এ দলের মূল স্তম্ভ ও শক্তি। আওয়ামী লীগের আদর্শ ও কার্যকলাপের প্রতি হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েই এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিএনপি এর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষ যা আশা করেছিল তার প্রতিফলন ঘটেনি এ দলটির কার্যকলাপের ভিতরেও। মুখে যতখানি জাতীয়তাবাদী বা হিন্দুস্থান বিরোধিতার কথা বলা হচ্ছে, কার্যে তার বাস্তব রূপ দিতে পারেনি বিএনপি তার দলীয় নীতি বাস্তবায়নে। বক্তৃতায় যত ইসলামী ভাবধারার কথাই বলা হোক না কেন, এ দলটির যাঁরা নেত্রী বা নেতা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রায় আওয়ামী লীগ নেত্রী বা নেতাদের মতই ইসলামের বাস্তব অনুসরন খুব কমই আছে। আওয়ামী লীগের মতই এ দলটিতেও অনেক নেতা আছেন যাঁরা সমাজে ইসলামের প্রকৃত ও সত্যিকার বাস্তবায়ন চান বলে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। অধিকন্তু, এ দলটিও

www.pathagar.com

তার দলীয় প্রধান নির্বাচনে বিশেষ পারিবারিক গন্ডীর সীমা অতিক্রম করে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ধারায় সামিল হতে সক্ষম হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে না আওয়ামী লীগ। বক্তৃতার মাধ্যমে আসর গরম করলেও বাস্তবে বিএনপি বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হিন্দুস্থানী কোন কার্যকলাপের বিরুদ্ধেই সক্রিয় কোন ব্যবস্থা গ্রহন করার মত সৎসাহস দেখাতে পারেনি। হিন্দুস্থানের পানি আগ্রাসন, সীমান্ত হামলা, পার্বত্য চট্টগ্রামে অসন্তোষ সৃষ্টি এবং তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের মত জঘন্য কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিএনপি সত্যিকার অর্থে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কোন বাস্তব পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। তাই অনেকে গোস্বা করে বলে থাকেন যে, আসলে বিএনপি হিন্দুস্থান বিরোধী বা বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষাকারী মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক বিশেষ কোন দল নয়। এ দলটির যাঁরা নেত্রী-নেতা তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বক্তৃতায় রঙিন কথার ফানুস ছড়িয়ে দেশের মানুষকে সম্মোহীত করে দেশের ক্ষমতা দখল করা এবং তার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেত্রী-নেতাদের মত একইভাবে দেশের সম্পদ লুট করা। তবে যে যাই বলুক বা ভাবুক, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে বাঁচাতে হলে বিএনপিই হচ্ছে শেষ এবং একমাত্র ভরসা। এ ব্যাপারটি যত শীঘ্র বিএনপির নীতিনির্ধারকগণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং সেই অনুসারে জাতীয় স্বার্থে দলটির নীতি ও কার্য পরিচালনা করেন ততই দেশের জন্য মঙ্গল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপারে ধারাবাহিক আলোচনা শেষে এবার আমরা এমন একটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা বাংলাদেশের রাজনীতিকে সত্যিকার অর্থেই জটিল ও কলুষিত করে তুলেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে এমন একটি তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে যারা বিশেষ কোন আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজনীতি করেন না। এরা রাজনীতি করেন শুধু এবং শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে। দেশ, জাতি বা দলীয় স্বার্থ এদের কাছে কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান এই রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরাই (political prostitutes)হচ্ছে বর্তমানে দেশ ও জাতির জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। এরা নিজেদের স্বার্থে না পারে হেন কোন কর্ম নেই। এরা আজকে এক দলে আবার কালকে আরেক দলে। বর্তমানে এরা রাজনীতিকে একটি লাভজনক ব্যবসার পন্যে রূপান্তরিত করেছে। ক্ষমতালাভ এবং মন্ত্রিত্বগ্রহনই হচ্ছে এদের একমাত্র কাজ এবং রাজনীতি। এরা সব সময়েই সরকারী দলের হয়ে রাজনীতি করেন। পর পর ধারাবাহিকভাবে বিপরীতধর্মী তিনটি দলের মন্ত্রী হয়ে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করেছেন এমন নেতার সংখ্যাও এ দেশে কম নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে যত তাড়াতাড়ি এই সমস্ত রাজনৈতিক আগাছা ও ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা যায় জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

এ প্রসঙ্গে জাতির জন্য দুঃখজনক আরেকটি দিকের প্রতি আলোকপাত না করলেই নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে এ দেশে ইসলামের জন্য

www.pathagar.com

অনেকটা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। কেন বা কিভাবে তারও অনেক দিকই আলোচনা করেছি। যে দিকটি নিয়ে আলোচনা করিনি তা হলো, বর্তমানে এ দেশে যাঁরা ইসলামী রাজনীতি করেন, সেই সমস্ত ইসলামী দলীয় নেতাদের ভিতর ঐক্য বা সহযোগিতার মারাত্মক অভাব হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামপন্থী আন্দোলন ও তার সাফল্যের ব্যাপারে একটি বিরাট অন্তরায়। এ দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী দলের অনেক নেতাই অকারনে একে অন্যকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। বরং তাঁরা একে অন্যের প্রতি অহেতুক কাদা ছোড়াছুড়িতেই বেশী আনন্দ পান। দেশে ইসলামের নামে নিত্য নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম হচ্ছে। কোন বৃহত্তর আন্দোলনে বা নির্বাচনের সময়ও এ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একত্র হয়ে দেশে কোন নির্বাচনী জোট বা ফ্রন্ট গঠন করতে পারছে না। উল্টো, তারা নির্বাচনে ফায়দা আদায়ের উদ্দেশ্যে এমন সব রাজনৈতিক দলের সাথে একত্রিত হয়ে ফ্রন্ট গঠন করে চলেছেন, যে সমস্ত দল এবং তার নেত্রী-নেতারা দেশে আদৌও ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী নয়। ক্ষমতার স্বাদগ্রহনে ব্যতিব্যস্ত এ সমস্ত ইসলামপন্থী নেতারা তাই অনেক সময়ই তাঁদের সমর্থিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী কোন সরকার কর্তৃক কোন ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমেরও বিরোধিতা করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। বর্তমানে বাংলাদেশে নারী-স্বাধীনতা, নারী-অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনা এবং এইড্স প্রতিরোধের নামে যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে ও একান্তভাবেই ইসলাম পরিপন্থী ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বর্তমানে এ দেশের কোন ইসলামী দল বা ইসলামপন্থী নেতাই তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করছেন না। সরকারপন্থী বা সরকার-বিরোধী সমস্ত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদেরই একই অবস্থা। মনে হচ্ছে, কে যেন এঁদের মুখে শক্ত করে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী নেতাদের মধ্যে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই এখন তাঁদের আখের গুছাতেই বেশী ব্যস্ত, ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে বা বিশেষ কোন নির্যাতন সহ্য করতে তাঁরা একেবারেই নারাজ। এ যদি দেশের ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা হয় তা হলে দেশে ইসলাম কায়েম হবে কি করে? বাংলাদেশের বর্তমান ইসলামপন্থী নেতারা দু'একজন বাদে সবাই, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে , ইসলামের জন্য যুগ যুগ ধরে কোরবাণী দেওয়ার সেই গৌরবোজ্জল অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের কথা, বোধ হয়, একেবারেই ভুলে গিয়েছেন। তা না হলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি মুসলিম দেশে কোন যুক্তিতে বা কোন সাহসে তথাকথিত একটি ইসলামী ভাবধারার, নাকি ইসলামী ভাবধরার, সরকার দেশের তথা পরিবারের স্বাভাবিক কর্ণধার পুরুষদের বাদ দিয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা অবৈতনিক করে দেয় এবং তার বিরুদ্ধে কেন এ দেশের আলেম সমাজ বা তথাকথিত ইসলামী দলগুলির কোন নেতা বা নেতাদের পক্ষ থেকে সরব কোন প্রতিবাদ হচ্ছে না? এ ছাড়া, চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে সমতা বা নারীর ক্ষমতায়নের নামে অহেতুক কোটা সৃষ্টি করার মাধ্যমে

www.pathagar.com

যা চলছে তারই বা প্রয়োজন কি এমন একটি মুসলিম দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ পুরুষ-বেকার কর্মসংস্থানের অভাবে সমাজে ব্যাপকভাবে বিপথগামী হচ্ছে প্রতিনিয়ত? এ ছাড়া, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং এইড্‌স প্রতিরোধসহ অন্য অনেক ব্যাপারে দেশের সরকারী প্রচারমাধ্যমগুলিতে যে ব্যাপক প্রচারণা চলছে তা তো সবই ইসলাম পরিপন্থী। কিন্তু দেশের সরকার-বিরোধী এবং সরকার-সমর্থক কোন আলেম বা ইসলামপন্থী নেতারাই তো এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসছেন না। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের সাথে এমন মোনাফেকী এবং বেঈমানী করলে এ দেশে কোন দিনও ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে না।

www.pathagar.com

ষোল

এ বইয়ের ইতিপূর্বেকার বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলাদেশ আন্দোলন, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে দেশের শিল্পকারখানা ধ্বংস, হিন্দুস্থান কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, দেশের শাসকদল কর্তৃক ব্যাপক গণ-হত্যা, গণতন্ত্রের নামে বাকশাল প্রতিষ্ঠা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি, সর্বব্যাপ্ত দুর্নীতি ও সন্ত্রাস, চরম নৈতিক অবক্ষয়, গণতন্ত্রের বদলে পরিবারতন্ত্র, রাজনৈতিক দলগুলির বেহাল অবস্থা, ইসলামী রাজনীতির করুন দশা এবং হিন্দুস্থানের পানি আগ্রাসন, সীমান্ত হামলা, চোরাচালান, নানান সমস্যা সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে রাখার অপপ্রয়াস ও হিন্দুস্থানী গুপ্তচর সংস্থা "র" এর সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপ্ত বাংলাদেশ-বিরোধী তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে গ্রাস করার জঘন্য চক্রান্তসহ নানাবিধ সমস্যা ও সংকট নিয়ে আমরা মোটামুটি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ১৯৭০ সনের নির্বাচনে এ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে পাকিস্তান ভেঙ্গে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দেয়নি। তারা নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ব্যাপকভাবে বিজয়ী করেছিল শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের ভাষায় তখন পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভিতর বিদ্যমান তথাকথিত ব্যাপক বৈষম্য দূর করার জন্য এবং তার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণকে শেখ মুজিব কর্তৃক বহুল প্রচারিত সেই স্বপ্নসাধের মায়ামৃগ "সোনার বাংলা" উপহার দেওয়ার জন্য। দুনিয়ার ইতিহাসে অতীতেও এমন কোন রাষ্ট্র ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই কখনও হবে না, যে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর প্রকৃতির ও বাস্তবতার কারণে কম-বেশী বৈষম্য বা অর্থনৈতিক পার্থক্য ছিল না, নেই বা থাকবে না। কিন্তু সেই পার্থক্যের কারণে কোন দিনই একটি রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তার ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী থেকে জাতির চিরন্তন দুশমনদের প্ররোচনায় আলাদা হয়ে যায় না বা বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নামে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে না। কিন্তু এ দেশে ১৯৭০ সনের নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগ সেই অস্বাভাবিক কাজটিই করেছিল। আর আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে জাতিকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে একেবারেই অপ্রস্তুত অবস্থায় এক অজানা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মাঝে ঠেলে দিয়েছিল যার ফলে এ দেশের লক্ষ লক্ষ নিরিহ মানুষকে অকারণে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। এ ছাড়া, দেশের সকল মানুষকে পোহাতে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে নিদারুন যন্ত্রণা। এ সবের জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ এবং একমাত্র আওয়ামী লীগ। সে দিন যদি আওয়ামী লীগ নেতারা হঠকারিতার পরিবর্তে একটু বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন তা হলে ভাইয়ে

www.pathagar.com

ভাইয়ে এ জঘন্য হানাহানি আর খুনাখুনির মোটেই প্রয়োজন হতো না। সারা দুনিয়ার মুসলিম ভাইদের কথায় কর্ণপাত না করে শুধুমাত্র ব্রাহ্মন্যবাদীদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হবার বেদনাদায়ক পরিণতিই ছিল ১৯৭১ সনের বিয়োগান্ত নাটক।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ছিল মুসলিম বিশ্বের শত্রু আন্তর্জাতিক মুসলিম বিরোধী চক্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্র ও কার্যক্রমের ফল। উপমহাদেশের মুসলমানদের জঘন্য শত্রু ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে মুসলিম বিশ্বের পহেলা নম্বর দুশমন নাস্তিকতাবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সে সময়কার প্রেসিডেন্ট ব্রেজেনেভ এর অবৈধ মিলনের ফলে সৃষ্ট মুসলিম বিশ্বের একান্তভাবে অনাকাঙ্খিত ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের উদর থেকে বেরিয়ে আসা অবাঞ্ছিত ফসল হচ্ছে বাংলাদেশ । উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণ বা মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়নি। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল দুনিয়ার বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করে বিশ্ব-মুসলিম শক্তি ও স্বার্থকে ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে।

তবে এখন কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ যে ভাবেই বা যারা যে উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, বাংলাদেশ তো বর্তমানে একটি কঠিন রুঢ় বাস্তব। বাংলাদেশ তো আজ একটি বাস্তব সত্যি। বাংলাদেশ তো আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। অন্ততঃ হিন্দুস্থানের সাথে শেখ মুজিব কর্তৃক সম্পাদিত তথাকথিত "মৈত্রীচুক্তি"র মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আর কোন সংশয় তো থাকার কথা নয়। এ ক্ষেত্রে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সময় যদি তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতারা হিন্দুস্থানের কাছে কোন গোপন এক বা একাধিক দাসখত দিয়ে থাকেন যা এখনও প্রকাশ করা হয়নি, সেটা এ দেশবাসীর বিবেচ্য নয়। এখানে একটি অপ্রিয় রূঢ় বাস্তবের কথা উল্লেখ করতে হয়ঃ সমাজে জারজ সন্তান জন্মদান বা গর্ভে ধারন করা মারাত্মক গর্হিত কাজ, কিন্তু সেই জারজ সন্তান যদি একবার জন্ম গ্রহণ করেই বসে তা হলে তাকে হত্যা করা আরো মারাত্মক গর্হিত কাজ। জারজ সন্তান জন্মদান বা গর্ভে ধারন করা যেমন উচিত নয়, ঠিক তেমনি ভূমিষ্ট হয়ে গেলে পরে তাকে আর হত্যা করাও যায় না।

বাংলাদেশ একটি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। বাংলাদেশ বর্তমানে দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় নব্বই শতাংশই মুসলমান। বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশের বাস ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশটিতে। এই বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কোন কারণেই কোনক্রমেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। যে ভাবেই হোক এ মুসলিম রাষ্ট্রটিকে বাঁচাতেই হবে। এ যে আমাদের সবারই আবাসভূমি। এ দেশ যদি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে কোথায় যাব আমরা? তা হলে কোথায় যাবে আমাদের সন্তান-সন্ততি বা ভবিষ্যৎ বংশধরেরা?

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে এবং একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসাবে একে গড়ে তোলতে হলে সবার আগে প্রয়োজন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য। আর এ জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলতে হলে আমাদের সবাইকে খোলা মন নিয়ে তাকাতে হবে সামনের দিকে। আমাদের ভুলে যেতে হবে অতীতের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি এবং তিক্ততা। ১৯৭১ সনে কারা কোন মত বা পথের পথিক ছিল, সেটাই আজকে একমাত্র বিবেচ্য নয়। বাংলাদেশের বিগত বত্রিশ বছরের পথ পরিক্রমার পরে আজ কারা কি ভাবছে বা করছে সেটাই বড় কথা, মুখ্য বিবেচনার বিষয়। ১৯৭১ সনে কারা রাজাকার, আল-বদর, আল-সাম্‌স বা তথাকথিত পাকিস্তানী দালাল ছিল, শুধু সেটা মনে রেখে বসে থাকলেই চলবে না। উল্টোভাবে, পাকিস্তানপন্থীদের ভাষায়, ১৯৭১ সনে কারা হিন্দুস্থানের সেবাদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সব নিয়ে অহেতুক বাক-বিতন্ডা করে কোন লাভ নেই। এ সব নিষ্ফল তর্ক জাতির জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না। বরং জাতির মাঝে এ বিভেদ সৃষ্টিকারী অবাঞ্ছিত বিতর্ক আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যারা দুশমন তাদেরই সাহায্য করবে। দেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে হলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইস্পাত-কঠিন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য। যারা আজও এ দেশের প্রাণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মধ্যে বিভেদ জিয়িয়ে রাখতে চায় তারা সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানেই হোক এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। ১৯৭১ সনে কে বা কারা কেন কি করেছে তা বাদ দিয়ে চিন্তা করতে হবে ও বিবেচনা করতে হবে আজকের প্রেক্ষিতে কে বা কারা বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করছে। সে দিন যদি হিন্দুস্থানের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ না হতো তা হলে, আমার তো মনে হয়, এ দেশের লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানপন্থী সমর্থকদের অনেকেই হয়তো নীরব থাকতেন নতুবা বাংলাদেশেরই পক্ষ অবলম্বন করতেন। সে দিনের পাকিস্তানপন্থীদের তো ভয় ছিল, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সহায়তাকারী হিসাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী চিরন্তন দুশমন ব্রাহ্মন্যবাদীদের খপ্পরে পড়ে প্রায় চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ক্ষুদ্র দেশটি একবার হিন্দুস্থানের পকেটে ঢুকে গেলে পরবর্তীতে ব্রাহ্মন্যবাদীরা একে পিষে মেরে ফেলবে এবং মুসলিম বাংলাকে যে নিষ্ঠুর শোষণ করবে তার কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। পাকিস্তান সমর্থকদের সেই সন্দেহই তো আজ কঠিন রূঢ় বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহায়তা ও মৈত্রীর নামে হিন্দুস্থানই তো এ দেশটাকে আজ সমস্যায় জর্জরিত করে তুলেছে। এটাই যদি আজ সত্য হয় তা হলে সে দিনের পাকিস্তানপন্থীদের দোষটা কোথায়? তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে কারওই অযথা কারো দোষ-ত্রুটি খোঁজা উচিত হবে না। আজ দরকার, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাগিদে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে একজোট হয়ে কাজ করা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র

www.pathagar.com

হিসাবে গড়ে তোলা। এ ছাড়া, অন্য কোন পথ নেই জাতির সামনে।

আরো একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সে দিন যারা পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে সক্রিয় ছিলেন তারাও, যে যাই মনে করুন না কেন, সত্যিকার অর্থে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ও সক্রিয় সদস্যদের চেয়ে কোন অংশে কম দেশপ্রেমিক ছিলেন না। পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থক সক্রিয় ব্যক্তিবর্গ তো একটি বাস্তব সত্য তথা একটি বাস্তব রাষ্ট্রকে রক্ষা ও হেফাজত করার সংগ্রামেই শুধু লিপ্ত হয়েছিলেন। নিজের দেশে বসে নিজের প্রিয় মাতৃভূমি নিজস্ব একটি রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে যাওয়া বা চাওয়া অবশ্যিই দোষের কোন কাজ হতে পারে না। এ ব্যাপারে যা করনীয় তা হচ্ছে, এখন এ সমস্ত লোকজন কি ভাবছে বা করছে তা যাচাই করে দেখতে হবে। এ জাতীয় লোকদের ভিতর অনেক নেতাই তো ইতিমধ্যে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরসহ বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ সুনাম, দক্ষতা ও সফলতার সাথে জাতির সেবা করেছেন এবং অনেকে এখনও করছেন। কই এ দেশের জনগণ তো তাদের মাথায় বিজয় ও গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিতে কোন নির্বাচনে দ্বিধা করেনি! তা হলে যারা অকারণে এ নিয়ে হৈ চৈ করছেন, তারা আসলে কি চান? কার স্বার্থে বা কার প্ররোচনায় একদল লোক দেশের জনগণের মাঝে অনাকাঙ্খিত এ অবাঞ্ছিত বিভেদ সৃষ্টির অশুভ পাঁয়তারা করছে? সেদিনকার পাকিস্তান সমর্থক এবং পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় লক্ষ লক্ষ সাচ্চা দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীকে আর অকারণে এ দেশের বিরুদ্ধে ঠেলে দিতে চেয়ে তাদের মূল্যবান সেবা থেকে দেশ ও জাতিকে বঞ্চিত করে একদল অযোগ্য লোকদের দ্বারা দেশটাকে অবাধ শোষনের শিকার হতে দেওয়ার মত বোকামীর কোন যুক্তি বা কারণ আজ থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সত্যিই যারা মঙ্গল কামনা করেন তাদের গভীরভাবে চিন্তা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

এ ক্ষেত্রে একটি কথা না বল্লেই চলে না। ১৯৭১ সনে যারা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন, সেই সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই যে নৈতিক এবং চারিত্রিক দিক থেকে ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন তাও তো ঠিক নয়। এরাও সমাজের সাধারণ মানুষই ছিলেন। মানবিক দোষ-ত্রুটি এদের ভিতরও ছিল। বরং, রূঢ় সত্যকথাটি হচ্ছে, তখনকার দিনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কোন ভদ্রলোক যেমন সাধারণতঃ আওয়ামী লীগের নেতা বা কর্মী হয়ে কাজ করতেন না, ঠিক তেমনিভাবে বাস্তবে ১৯৭১ সনের মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে সমাজের বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সদস্য বা তরুণও খুব বেশী ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতর বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক কুদ্দুস মোল্লার মত কুখ্যাত ডাকাতও তো ছিল। এরাই এ দেশে পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে অনেক কলঙ্ক লেপন করেছিল। এ ছাড়াও, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে অদ্যাবধি যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপকর্ম সাধনের পরে হিন্দুস্থানে গিয়ে আস্থানা গাঢ়ে বা ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মুষ্ঠিমেয় যারা

www.pathagar.com

হিন্দুস্থানের সেবাদাস হিসাবে সক্রিয় আছেন তাদের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। বঙ্গভূমিওয়ালা চিত্ত সুতাররাও তো ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭১ সন শুধু নয়, ২০০৩ সাল বা ভবিষ্যতের কাজের আলোকেই আজ আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে এ দেশের তথাকথিত পাকিস্তানী দালাল বা ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের। ১৯৭১ সনের কোন ভূমিকার জন্য কেউ এ দেশে, ফেরেস্তা বা শয়তান হয়ে যায়নি। কাউকে পুরস্কার দিতে বা তিরস্কার করতে হলে তা তার বর্তমান কাজের নিরিখেই করতে হবে, অন্য কোন বিচারে নয়। এ বাস্তবতা মেনে না নিতে পারলে জাতির কোন দিন কল্যান সাধন সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে বিদ্যমান দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নেতা-কর্মীদের এ কঠিন বাস্তবতার কথা মনে রেখে যথেষ্ট সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। কারো ইচ্ছানুসারে সবাই মিলেমিশে দেশটাকে গড়তে হবে। যারা সে দিন পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে, এ দেশে আর কোন দিন পাকিস্তান হবে না। আমার মনে হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে এমন কোন লোক অবশ্যই নেই যারা এ দেশে আবার পাকিস্তান হবে ভাবছেন। মাঝখানে এক হাজার মাইল বিস্তৃত একটি জঘন্য দুশমন রাষ্ট্র ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান অবস্থান করার ফলে যে পাকিস্তান একদিন আত্মকলহ ও হানাহানির ফলে বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তা আবার সংযুক্ত হয়ে নতুন করে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কোন কারণ বা যুক্তি অবশ্যই নেই। তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়ার মত বোকামী করলে তা এতদঞ্চলে মুসলমানদের কল্যাণের চেয়ে বরং অকল্যান ও সংঘাতই বয়ে আনবে। আজ যা দরকার তা হচ্ছে অন্য কিছু। আজ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের অভিন্ন দুশমন হচ্ছে প্রতিবেশী ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থান চায় না পাকিস্তান বা বাংলাদেশ নামে উপমহাদেশে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রই টিকে থাকুন। এ দেশ দু'টিকে গিলে খেয়ে ফেলার জন্য হিন্দুস্থান প্রতিনিয়তই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান উভয় দেশের জনগণই আজ এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। তাই পিছনের সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির কথা ভুলে গিয়ে আজ আমাদের উচিত ভ্রাতৃপ্রতিম এই দুই দেশের ভিতর সুদৃঢ় ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলা। এ দু'দেশের ভিতর কে কত শক্তিশালী বা দুর্বল সেটা বড় কথা নয়। আজ আমাদের নিজেদের স্বার্থে ও বাঁচার তাগিদে একের দুর্দিনে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রয়োজনে এক ভাইয়ের সাহায্যে আরেক ভাইকে এগিয়ে আসতে হবে সর্বাত্মক সাহায্য নিয়ে। তা হলে আমাদের অভিন্ন দুশমনরা কোন দিনও আমাদের কোন ভাইয়েরই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এর পরে, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের সাথে গড়ে তোলতে হবে আমাদের সুদৃঢ় ভ্রাতৃবন্ধন। কেননা, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদের প্রতি যে সতর্কবানী ঘোষণা করেছেন তা বিস্মৃত হলে চলবে না। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন যে, ইহুদী-নাসারাগণ মুসলমানদের

www.pathagar.com

বন্ধু নয়; মুসলমানদের বন্ধু ও ভাই মুসলমানগণই। মহান রাব্বুল আল-আমীনের এই সতর্কবানী মনে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে প্রতিটি কাজে। তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের বিজয় ও সফলতা অনিবার্য। কেউ কেউ এ দেশে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে একটি কণফেডারেশন গঠনের কথা বলে আসছেন বিগত কিছু দিন ধরে। আমার মনে হয়, এটা সঠিক হবে না। অমন একটি পদক্ষেপ নিলে বরং নতুন গোলযোগ ও সমস্যা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাবে হিন্দুস্থান বা এ দেশের হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসীরা। তার চেয়ে, দু'দেশের ভিতর সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ও সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করাই হবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। পরবর্তীকালে দু'দেশের জনগণ ইচ্ছা করলে বা প্রয়োজন মনে করলে তখন যা-ই দরকার তা-ই করতে পারবে বা করবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে এমন একটি গোষ্ঠী আছে যারা ১৯৭১ সনের মত এখনও ভাবছে, এ দেশ হিন্দুস্থান হয়ে যাবে। এরা আসলে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছে। বাংলাদেশ কোন দিনও হিন্দুস্থান হবে না, ইন্‌শ আল্লাহ্। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের বুকে টিকে থাকার জন্যই জন্ম নিয়েছে। হিন্দুস্থানের কোন চক্রান্ত আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারবে না। কোন দিন যদি হিন্দুস্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাতের অপচেষ্টার মত পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায় তা হলে তা হিন্দুস্থানেরই সর্বনাশ ডেকে আনবে এবং এ দেশে হিন্দুস্থানী সেবাদাস-দাসী সেই বিশেষ গোষ্ঠীটির জান-মাল বিপন্ন করে তুলবে। মুসলিম বাংলার কমপক্ষে ১২ কোটি তওহীদী জনতাকে পদানত করা অত সহজ কাজ নয়। হিন্দুস্থানের সে আশার গুড়ে বালি।

এ দেশ আর কোন দিন পাকিস্তান হবে না। অথবা পাকিস্তানও কোন দিন বাংলাদেশ আক্রমন করবে না। তবে অন্য সমূহ বিপদ আছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের সামনে আজ দু'টি বিকল্প আছে। এক, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়ার বুকে একটি গর্বিত জাতি হিসাবে টিকে থাকবে। দুই, নতুবা বাংলাদেশ হিন্দুস্থানের পদানত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা হারিয়ে হিন্দুস্থানের গোলাম হয়ে চিরস্থায়ী ব্রাহ্মন্যবাদী শাসন ও নিষ্ঠুর অমানবিক শোষনের শিকার হবে। দ্বিতীয় পথটি ধরে হিন্দুস্থান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দূর পথ পাড়ি দিয়েছে। এখন উপরোক্ত দু'টি পথের কোনটি বাংলাদেশীরা বেছে নিবে সেটা এ দেশের গণ-মানুষের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। যদি এ দেশের মানুষ সত্যিই হিন্দুস্থানী হায়েনাদের ছোবল থেকে দেশকে বাঁচাতে চায় তা হলে তাদের সামনে উদ্যত কালনাগিনীর বিষাক্ত ছোবল যে ফনা ধরে আছে সে সম্পর্কে দেশবাসীকে যথাযথভাবে জানতে দিতে হবে ও সতর্ক করতে হবে এবং দেশটিকে রক্ষার জন্য অবশ্যই সত্যিকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। কিন্তু দেশে বিগত বত্রিশ বছর ধরে যা করা হচ্ছে তা তো হিন্দুস্থানের কাছ থেকে দেশকে রক্ষার পরিবর্তে যাতে হিন্দুস্থান তার অশুভ মতলব অনায়াসে হাসিল করতে

www.pathagar.com

পারে সেই পথটিই করে দেওয়া হচ্ছে। আজ বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক এবং রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে যা প্রচার করা হচ্ছে বা এ দেশের তরুণ সমাজকে যা শিখানো হচ্ছে তা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর ফলে, দেশের তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি গর্বিত হওয়ার বদলে বরং দিন দিন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। দেশের তরুণ সমাজকে তাদের গৌরবোজ্জল জাতীয় ইতিহাস অবশ্যই জানার ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলেই শুধু তারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রাণপণ এগিয়ে আসবে।

যদি কোন দিন, আল্লাহ্ না করুন, হিন্দুস্থান বাংলাদেশকে গ্রাস করতে পারে তা হলে এখানকার মুসলমানদের জীবনে যে কি সর্বনাশ নেমে আসবে তা কেউ আজ চিন্তা করতেও পারছে না। তা হলে হিন্দুস্থান পর্যায়ক্রমে এ দেশটিকে কাশ্মীর, ফিলিস্তিন এবং স্পেনের পর্যায়ে নিয়ে এসে এর গোটা মুসলিম জনপদকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আজ এ কথা শুনে হয়তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু যারা স্পেনে দীর্ঘ মুসলিম শাসনের ইতিহাস এবং তার পরে মুসলমানদের ভিতর আত্মকলহের সুযোগে দেশটি থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করণের করুন কাহিনী জানেন তারা স্বীকার করবেন যে, ব্রাহ্মন্যবাদীদের দ্বারা এখানেও তা সম্ভব হতে পারে। মনে রাখতে হবে, দেশটি দখল করে নিলে হিন্দুস্থানের হাত থেকে জান বাঁচাবার আর কোন পথ নেই আমাদের। কেউ নেই আমাদের পাশে যে বা যারা আমাদের আশ্রয় দিবে বা সাহায্য করবে। বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে তো বাঁচা যাবে না। এ ছাড়া, সামান্য যে অংশটুকু জুড়ে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ আছে সে মগের মুল্লুকে পালিয়ে গেলেও তো তারা আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের মতই আমাদেরও ধরে ধরে জবাই করবে। সুতরাং, মুসলিম বাংলার বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে, তাদের জাতীয় দুশমনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে এ দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব অটুট রাখা। জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট হলে এটা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু ঐক্যের বদলে বিভেদের পথে পা বাড়ালে সর্বনাশ ঠেকানো মুশকিল।

এখানে আরেকটি কথা মনে রেখে আমাদের সাবধান হতে হবে এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী পরিচালনা করতে হবে। আজ হোক কাল হোক, দুই বাংলা-বাংলাদেশ তথা পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলা একদিন এক হয়ে যাবেই। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। দুনিয়ার ইতিহাস হচ্ছে বিবর্তনের ইতিহাস। তাই এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো সে দিন বৃহত্তর আসামও একীভূত হয়ে যেতে পারে এর সাথে। তাই এ সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই আমাদের সামনে এগুতে হবে এবং সে ভাবেই কাজ করতে হবে। যদি এ ব্যাপারে আমরা সজাগ থাকি এবং সাবধান হয়ে কাজ করি তা হলে ভয়ের কিছুই নেই। আর যদি এ সম্ভাবনার কথা আমরা একেবারেই আমলে না আনি তা হলে ভবিষ্যতে মুসলিম বাংলা একদিন আবার ব্রাহ্মন্যবাদী নিয়ন্ত্রনে চলে যাওয়ার কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই এতদঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিবর্তনের ব্যাপারেও আমাদের চিন্তা-ভাবনা এবং প্রস্তুতি থাকতে হবে।

আমরা জানি, বিগত বত্রিশ বছরে বাংলাদেশের প্রায় সব কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশ এখনও একটি প্রচুর সম্ভাবনাময় দেশ। হিন্দুস্থান বা তার দোসররা আমাদের শিল্পকারখানাসহ অনেক কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছে সত্যি। কিন্তু ওরা আমাদের দেশের মাটি-সোনা বা আমাদের কাঁচা মাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ তো সব শেষ করে দিতে পারেনি। এখনও আমাদের হাতে আছে পাট, চা, চামড়া, মৎস্য, গ্যাস, মানব-সম্পদ এবং কৃষিজাত অন্যান্য বিবিধ পন্য, পোষাক-শিল্প ও পর্যটনসহ অনেক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ইতিমধ্যে, এ ক্ষেত্রগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও এগুলি একেবারেই শেষ হয়ে যায়নি। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সঠিকভাবে এ সম্পদ ও ক্ষেত্রগুলির যথাযথ সদব্যবহার করতে পারলে ভবিষ্যতে জাতির জন্য কল্যান বয়ে আনা মোটেই অসম্ভব নয়। পাকিস্তানী জামানায় একদিন এগুলির সদ্ব্যবহার করেই তো জাতি অতি দ্রুত উন্নতির শীর্ষ শিখরে উপনিত হতে পেরেছিল। তা হলে আমরা আজ কেন পারবো না?

বাংলাদেশকে ব্রাম্মন্যবাদী হিন্দুস্থানী ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের হাত থেকে রাহুমুক্ত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলতে হলে সর্বাগ্রে আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, দেশটি শাসন ও পরিচালনার জন্য যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে দেশ ও জাতির মঙ্গলকামনায় এমন একটি সরকারের হাতে বাংলাদেশের শাসনভার ন্যস্ত হলে এ দেশ এখনও রাতারাতি দ্রুত উন্নয়নের ধারায় ফিরে আসতে পারে অনায়াসে। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, দেশটি সামান্য কয়েক বছর ছাড়া সৎ লোকের পরিচালনায় ধন্য হতে পারেনি। শত প্রতিকূলতা এবং বিরাজমান চরম অবক্ষয়ের মাঝেও দেশে এখনও প্রচুর সংখ্যক সৎ ও যোগ্য লোক আছেন যাদের খেদমতে ধন্য হয়ে জাতি তার কাঙ্খিত পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন নির্বাচনে যে ব্যবস্থা চালু আছে তাতে সমাজের কোন সৎ, যোগ্য এবং ভাললোক নির্বাচিত হয়ে আসার জন্য কোনই উপায় নেই। বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে যে কোন প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে আসার জন্য আজ যা অপরিহার্য পূর্বশর্ত তা হচ্ছে প্রচুর টাকা এবং সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়োগ। এ দুই পন্থার সহায়তা না নিলে যদি কোন ফেরেস্তাও কোন নির্বাচনে প্রার্থী হয় তা হলে তারও নির্বাচিত হয়ে আসার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। তাই দেশে সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন বাংলাদেশের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। দেশের মানুষ চাইলে এ পরিবর্তন মোটেই অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য কাজ নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, হুলো বিড়াল দিয়ে ভাজা মাছের পাহারা দিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাংলাদেশে এতদিন ধরে শাসন ক্ষমতার শীর্ষে যাঁরা এসেছেন তাঁদের ভিতর মাত্র দু'জন ছাড়া সবাই নিজের এবং নিজেদের আখের গুছাবার জন্যই

www.pathagar.com

শুধু ব্যস্ত ছিলেন বা আছেন, দেশের মঙ্গলচিন্তায় সময় ব্যয় করার মত অবকাশ তাঁদের কারুরই ছিল না বা নেই।

বাংলাদেশে প্রচলিত সরকার ব্যবস্থার দিকেও আমাদের নজর দেওয়া দরকার। পাশ্চাত্যের সুশিক্ষিত উন্নত কোন দেশের অনুকরণে সে সমস্ত দেশে প্রচলিত কোন সরকার ব্যবস্থার হুবহু প্রচলনও আমাদের দেশে উপযোগী বা কাম্য নয়। আমাদের দেশের জনগনের রাজনৈতিক পরিপক্কতার মাত্রার কথা বিবেচনা করে দেশোপযোগী সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই শ্রেয় ও কল্যানকর। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের চেয়ে সৎ ও যোগ্য লোকের হাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ক্ষমতা থাকলে জাতীয় উন্নয়ন দ্রুত ও ব্যাপকহারে সম্ভব। দুনিয়ার যে কোন দ্রুত উন্নত দেশের দিকে তাকালে এ সত্য উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন সরকার পদ্ধতির ভিতর এ জন্যই তো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করা হয় কল্যানকর একনায়কতন্ত্র বা Benevolent Dictatorship-কেই। সাধারণ মানুষের দরকার পেটের ভাত ও পরনের কাপড়। গণতন্ত্র ধুয়ে পানি খেলে তো তাদের পেটের ক্ষুধা মিটবে না। তাই বলে আমি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করছি না। আমি এমন গণতন্ত্রের কথা বলছি যা দেশের গণ-মানুষের কল্যান বয়ে আনবে, গুটিকয়েক লোকের লুটপাটের হাতিয়ার হবে না। এমন গণতন্ত্র আমাদের দরকার, অন্য কোন মাকাল ফল নয়।

রাহমানুর রাহিম রাব্বুল আল-আমীন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালাই সমস্ত বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক ও নিয়ন্ত্রক। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার মালিক ও উৎস। মৃত্যুর পরে তাঁর কাছে আমরা আমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবো। দুনিয়ায় আমাদের মানবজীবন অতি ক্ষনস্থায়ী ও মহাজীবনের একটি সোপান মাত্র। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান শেষে রোজ হাশরের মহাবিচারের পরে আমাদের যে জীবন হবে সেখানে আমরা দুনিয়ায় আমাদের সমস্ত কাজের ভালমন্দ ফলাফল ভোগ করবো। অন্তহীন ওই জীবনই হবে আমাদের আসল ও সত্যিকারের জীবন। দুনিয়াতে আমরা কিভাবে আমাদের জীবন পরিচালনা করবো তার পথনির্দেশস্বরূপ যুগে যুগে পৃথিবীতে নবী ও রাসুল পাঠিয়ে বিভিন্ন ঐশ্বরিক কেতাবের মাধ্যমে পরম করুনাময় আল্লাহ্তায়ালা আমাদের জীবনপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়তম দোস্ত সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম মহামানব নবীকুল শিরোমনি মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোস্তফা হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ার শেষ ও শ্রেষ্ঠতম নবী। তাঁর মাধ্যমে নাজিলকৃত শ্রেষ্ঠতম ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনই হচ্ছে আল্লাহ্র তরফ থেকে মানব জাতির জন্য প্রেরিত শেষ ধর্মগ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থের মাধ্যমেই দুনিয়াতে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত মানব জাতির জীবন-ব্যবস্থার একমাত্র পথ হচ্ছে আল-কোরআনের নির্দেশিত পথ। ইসলামের মৌলবানী উপরোক্ত কথাগুলি যদি আমরা সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করি এবং ইসলামের অনন্য মহাবিপ্লবী মন্ত্র "মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী"-এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যদি

www.pathagar.com

আমরা খাঁটি ঈমানের তেজে তেজোদীপ্ত হতে পারি তা হলে ব্রাহ্মন্যবাদী হিন্দুস্থান কেন, গোটা দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যারা আমাদের পদানত করতে পারে। তা হলে আসুন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী মুসলিম বাংলার স্বাধীনতার সত্যিকার হেফাজতকারী ও চালিকা শক্তি তৌহিদে বিশ্বাসী বার কোটি মানুষ আজ থেকে আমরা প্রত্যেকে এক একজন খাঁটি মুসলমান হবার নতুন করে শপথ গ্রহণ করি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার নামে ওয়াদা গ্রহণ করি যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ব্রাহ্মন্যবাদী হায়েনাদের ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা অকাতরে আমাদের জান-মাল সর্বস্ব কোরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ্ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা সচেষ্ট হয়।" তা হলে আর দেরী কেন? বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতায় বিশ্বাসী ভাই ও বোনেরা আসুন, এখন থেকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও দলগত মত ও পথের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে সততা ও আদর্শের পথে অগ্রসর হই এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সব সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে দেশের সৎ ও যোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে আদর্শবান নেতাদের সুযোগ্য পরিচালনায় বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমাদের নিয়ত সহি হলে এবং মনে কোন কুটিলতা না থাকলে, ইন্শ আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আমরা সফলকাম হবো। নিশ্চয়ই এ মহান কাজে আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন। আমীন। আমীন। সুম্মা আমীন।

oo=====oo খতম oo=====oo

www.pathagar.com

www.pathagar.com